(২) সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের ওপর: বৃষশৃঙ্গ কিরাট চিহ্ন

INCHES
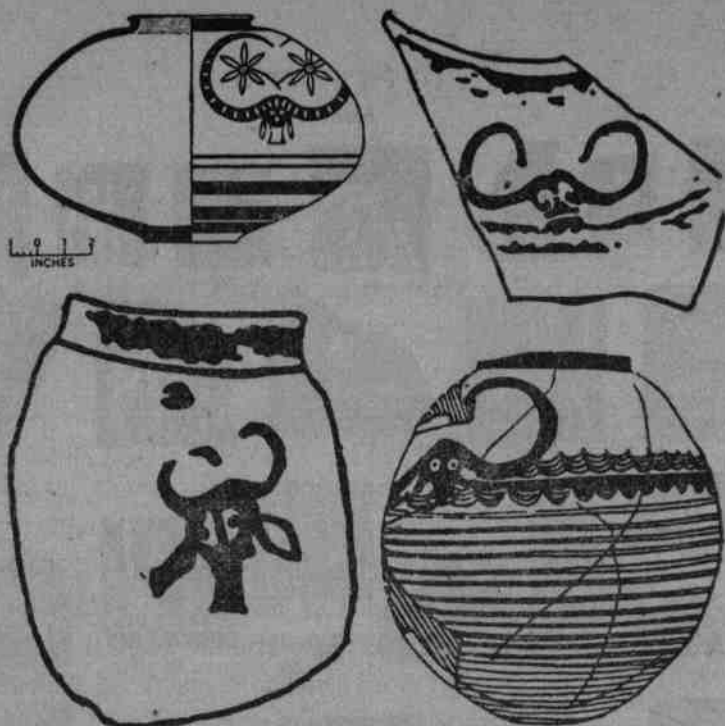
(৩) মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত দীর্ঘতম অভিলেখ

সিন্ধু সভ্যতার

স্বরূপ ও সমস্যা

ডঃ অতুল সুর

সূচী

ডঃ অতুল সুরের অন্যান্য বই—

৩০০ বছরের কলকাতা (৩য় সংস্করণ)
শিক্ষাপীঠ কলকাতা
ভারতের বিবাহের ইতিহাস (৪র্থ সংস্করণ)
দেবলোকের যৌনজীবন (৩য় সংস্করণ)
হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য (২য় সংস্করণ)
বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (৪র্থ সংস্করণ)
বাঙ্‌লা ও বাঙালীর বিবর্তন (২য় সংস্করণ)
আঠারো শতকের বাঙ্‌লা ও বাঙালী
বাঙ্‌লার সামাজিক ইতিহাস (৩য় সংস্করণ)
বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর (২য় সংস্করণ)
টাকার বাজার
ভারতে মূলধনের বাজার
শতাব্দীর প্রতিধ্বনি
কলকাতা ঃ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস (২য় সংস্করণ)
প্রসঙ্গ পঞ্চবিংশতি
সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা
মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা
আমরা গরীব কেন ?
প্রমীলা প্রসঙ্গ
ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়
দুই বাংলা কি এক হবে ?
আদিম মানব ও তার ধর্ম
মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য
চোদ্দ শতকের বাঙালী
শ্রাবণী (উপন্যাস)
স্বাধীন ভারতের আর্থিক কড়চা

নিবেদন

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার অধিকর্তা স্যার জন মার্শাল কর্তৃক প্রবুদ্ধ হয়ে সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অনুশীলন শুরু হয়েছিল মহেঞ্জোদারোয় ও সমাপ্ত হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমাপ্তিপর্বে যাঁরা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈতনিক গবেষকরূপে নিযুক্ত করে উৎসাহ দান করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ড. দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার। আমার অনুশীলনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'ক্যালকাটা রিভিউ'-তে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতে। কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি' পত্রিকায়। আমার অনুশীলনের ফলাফলে আমি বলেছিলাম যে সিন্ধু সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেনি, পরবর্তীকালের হিন্দু সভ্যতার মধ্যে সজীব ছিল এবং এখনও আছে। আমি আরও বলেছিলাম যে বোধ হয় সিন্ধুসভ্যতা গঙ্গা-উপত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আমার সে অনুমানকে বাস্তবে পরিণত করেছে।

এই সংস্করণে বইখানির পাঠ পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করা হয়েছে। তা ছাড়া অনেকগুলি চিত্র 'পরিশিষ্ট'-এ যোগ করা হয়েছে।

অতুল সুর

প্রাক্‌কথন

সিন্ধু সভ্যতাকে আজ আমরা 'হরপ্পা সভ্যতা' বলে অভিহিত করি। তার কারণ, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের মধ্যে হরপ্পা থেকেই আমরা সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যমূলক প্রত্নদ্রব্য প্রথম পাই। তবে সে আজ (১৮৫৩) থেকে ১৬৯ বছর আগেকার কথা। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ওই জায়গাটা প্রথম চার্লস ম্যাসন-এর নজরে আসে। তিনি ওই জায়গাটাকে কোন দুর্গনগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করেন। এরপর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার বার্নস জায়গাটি পরিদর্শন করেন। তখন জায়গাটি প্রাকৃতিক পাহাড়ের আকার ধারণ করেছিল। তবে তিনিও জায়গাটিকে কোন দুর্গনগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু জায়গাটির প্রকৃত প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এঁরা দুজনেই কিছু বলতে পারেন নি।

এখানে উৎখনন কার্য প্রথম শুরু হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেই বৎসরই এখানে উৎখনন শুরু করেন তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম। স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম পুনরায় এখানে উৎখনন করেন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ওই সময় তিনি যা দেখেছিলেন এবং উৎখনন করে যা পেয়েছিলেন, তার বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদনে।

কানিংহাম যে সময় হরপ্পায় গিয়েছিলেন সে সময় তিনি ইরাবতী নদীর তীরে বহু ধ্বংসস্তূপ দেখেছিলেন। বস্তুত তিনি ইরাবতী নদীর উত্তর, পশ্চিম, ও দক্ষিণে ৩,৫০০ ফুট ব্যাপী দীর্ঘ স্থানে ধ্বংসস্তূপের সমারোহ দেখেন। পূর্বদিকেও তিনি ২০০০ ফুট ব্যাপী দীর্ঘ স্থানে অনুরূপ ঢিবির সারি লক্ষ্য করেন। যদিও ঢিবিগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছিল, তাহলেও একস্থানে তিনি ৮০০ ফুট ব্যাপী জায়গায় ঢিবির অভাব লক্ষ্য করেন। এই ৮০০ ফুট ঢিবিহীন শূন্য ব্যবধানের কারণ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে পারেন নি।

ইরাবতী নদীর তীরে কানিংহাম যে ঢিবির সমারোহ দেখেছিলেন, তা আড়াই মাইল আয়তনের মত এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল।

উত্তর-পশ্চিমে সবচেয়ে বড় ঢিবিটার উচ্চতা ছিল ৬০ ফুট। দক্ষিণ-পশ্চিমের ও দক্ষিণের ঢিবিগুলির উচ্চতা ছিল ৪০ থেকে ৫০ ফুট, এবং ইরাবতী নদীর প্রাচীন খাতের দক্ষিণে অবস্থিত ঢিবিগুলি ২৫ থেকে ৩০ ফুট।

১৮৫৩ এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম যে উৎখনন করেছিলেন তার ফলে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ এবং ধ্বংসস্তূপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক চতুষ্কোণ বৃহৎ অট্টালিকার ভিত্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। লোকমুখে তিনি শুনেছিলেন যে রাজা হরপালের নাম থেকেই জায়গাটার নাম হরপ্পা হয়েছে। রাজা হরপালের সময় ওখানে এক বৃহৎ হিন্দু মন্দির ছিল। লোকমুখে তিনি আরও শুনেছিলেন যে রাজা হরপালের সময় 'রাজপ্রসাদী' প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে এই প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলি। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই প্রথাকে 'jus prima noctis' নামে অভিহিত করেন। দু'শ বছর আগে পর্যন্ত এই প্রথা স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী সকল প্রজাকেই তাদের নবপরিণীতা স্ত্রীকে প্রথম রাত্রিতে জমিদারের বা রাজার সম্ভোগের জন্য তাঁর শয়নকক্ষে পাঠিয়ে দিতে হত। প্রথাটা আমাদের দেশে এক সময় প্রচলিত 'গুরুপ্রসাদী' প্রথার অনুরূপ। এই শেষোক্ত প্রথা অনুযায়ী কুলগুরু সম্ভোগ না করলে, কেউ নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করতে পারত না। (কীভাবে এই প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছিল, তা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় বিবৃত হয়েছে।)

রাজা হরপালের সময় এই প্রথা প্রচলিত থাকার দরুন রাজা একবার তাঁর কোন এক নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে অজাচারে লিপ্ত হন। কেউ কেউ বলেন সেই আত্মীয়া তাঁর ভগিনী, আবার কেউ কেউ বলেন সেই আত্মীয়া তাঁর শ্যালিকা বা শ্যালিকার কন্যা। সে যাই হোক, এই দুষ্কর্মের জন্য মেয়েটি ভগবানের কাছে এর সমুচিত প্রতিশোধ প্রার্থনা করে। কেউ কেউ বলেন সেই মেয়েটির প্রার্থনা অনুযায়ী ভগবান হরপালের রাজধানী অগ্নিদগ্ধ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন ভগবান ভূমিকম্পের দ্বারা হরপালের রাজ্য বিনষ্ট করেছিলেন। আবার মতান্তরে কোন বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে রাজা হরপাল নিহত হন এবং তাঁর রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত

হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী ১২০০ বা ১৩০০ বৎসর পূর্বে রাজা হরপালের রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কানিংহাম বলেছিলেন যে এই তারিখটা যদি নির্ভুল হয়, তাহলে বলতে হবে যে ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাসিম কর্তৃক রাজা হরপালের রাজ্য বিনষ্ট হয়েছিল। কানিংহাম বলেছেন—'I am inclined to put some faith in this belief of the people, as they tell the same story of all the ruined cities in the plains of the Punjab, as if they had all suffered at the same time from some sudden catastrophe, such as the overwhelming invasion of the Arabs under Muhammad-bin-Qasim. The story of the incest also belongs to the same period, as Raja Dahir of Alor is said to have married his own sister.'

উৎখননের ফলাফল সম্বন্ধে কানিংহাম বলেছিলেন যে রেলপথ নির্মাণের জন্য ঠিকাদাররা এই সকল ঢিবি থেকে ইট সংগ্রহ করে ঢিবিগুলিকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল যে তিনি এই সকল স্থান থেকে বিশেষ কিছু প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। (এই সকল স্থান থেকে ঠিকাদাররা এত বিপুল পরিমাণ ইট সংগ্রহ করেছিল যে ১০০ মাইল পরিমিত রেলপথ সম্পূর্ণভাবে হরপ্পা থেকে সংগৃহীত ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।)

বিশেষ কিছু প্রত্নদ্রব্য কানিংহাম না পেলেও তিনি যা পেয়েছিলেন (চিত্র দেখুন) তা আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পাথরের তৈরি কয়েকটি ছুরির ফলাকা (কোনো কোনোটির একদিকে শান দেওয়া ও কোনো কোনটির দুদিকেই), প্রাচীন মৃৎপাত্র, এবং মেজর ক্লার্ক কর্তৃক সংগৃহীত সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহরের অনুরূপ লিপি ও বলদের প্রতিকৃতিযুক্ত একটি সীলমোহর (চিত্র দেখুন) পেয়েছিলেন।

১৮৫৩-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম কর্তৃক হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত বস্তুদ্রব্য
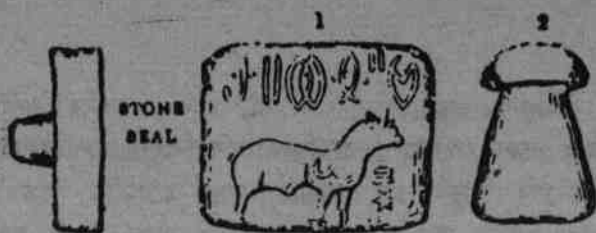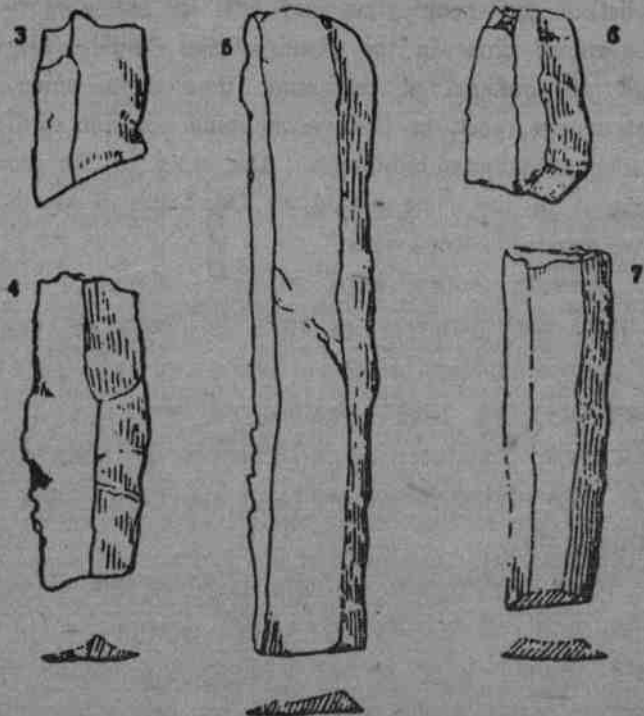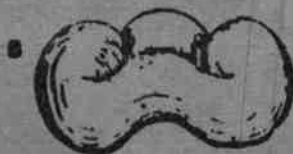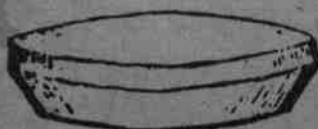
। 'দুই' ।

১৮৭২ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চাশ বৎসরের দীর্ঘকাল। এই পঞ্চাশ বৎসর কাল কানিংহাম কর্তৃক সংগৃহীত সীলমোহরটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদন গ্রন্থের মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কেউ কোনদিন সে-সম্বন্ধে মাথা ঘামান নি। ওই নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়, যখন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জো-দারোর ঢিবির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন। রাখালদাসের পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞরা যে মহেঞ্জোদারোর ঢিবিটা পরিদর্শন করেন নি, তা নয়। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেই তাঁরা এটা পরিদর্শন করেছিলেন, এবং এটাকে অর্বাচীন যুগের ঢিবি বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে যে এরূপ ভুল হয় না, তা নয়। ঠিক অনুরূপ ভুল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞরা বাঙ্‌লা দেশের চন্দ্রকেতুগড় সম্বন্ধে করেছিলেন। এখানে উৎখননের ফলে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। তারপর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞরা এটাকে 'ডেড্ স্পট' বলে এখানকার উৎখননকার্য বন্ধ করে দেন। কিন্তু পরে ওখান থেকে চমকপ্রদ ভাবে পাওয়া যায় খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত নানা বর্ণের ও নানা আকারের মৃৎপাত্রসমূহ। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে মহেঞ্জোদারো অর্বাচীন যুগের ঢিবি, এরূপ মন্তব্য করা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞদের পক্ষে কোন বিচিত্র ব্যাপার ছিল না। রাখাল-দাসের আবিষ্কারের পর উৎখননের ফলে এখান থেকে যে-সকল প্রত্নদ্রব্য পাওয়া যায়, তার সচিত্র বিবরণ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা স্যার জন মার্শাল যখন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের 'ইলাসট্রেটেড্ লণ্ডন নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তখনই বিশ্বের পণ্ডিত-মণ্ডলী নিকট-প্রাচীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার জ্ঞাতিত্বের কথা আমাদের শোনান।

মহেঞ্জোদারো সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আর হরপ্পা মহেঞ্জোদারো থেকে ৪০০ মাইল উত্তর-পূর্বে ইরাবতী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। এই দু'জায়গা থেকে উৎখনিত প্রত্নদ্রব্যসমূহ প্রমাণ করে যে অতি প্রাচীনকালে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের

বিশাল ভূখণ্ডে এক অতি উন্নত মানের সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এর ফলে ১৯২২ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উৎখনন চলতে লাগল এই সভ্যতার স্বরূপের অনুসন্ধানে। উক্ত সময়কালের মধ্যে হরপ্পাতে উৎখনন কার্য চলেছিল দয়ারাম সাহানী ও মাধো স্বরূপ ভাটের তত্ত্বাবধানে। আর মহেঞ্জোদারোতে উৎখনন চলেছিল স্যার জন মার্শাল ও আরনেস্ট ম্যাকের তত্ত্বাবধানে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকে পুনরায় উৎখনন চালান। এই সব উৎখননের ফলে আমরা যা-কিছু আবিষ্কার করেছিলাম, তা থেকে আমরা সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার মার্টিমার হুইলার পুনরায় হরপ্পায় খননকার্য চালিয়ে ওই নগরীর ইষ্টক-নির্মিত প্রাকার আবিষ্কার করেন। এর পর দেশবিভাগ হওয়ার ফলে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান সরকারের অধীনে স্যার মর্টিমার হুইলার মহেঞ্জোদারোতে খননকার্য চালিয়ে হরপ্পার অনুরূপ দুর্গ-প্রাকার মহেঞ্জোদারোতেও আবিষ্কার করেন। কিন্তু উৎখনিত স্তরের তলদেশে জল প্রকাশ পাওয়ার ফলে মাত্র কিছু অংশ (তলদেশ থেকে) উৎখননের পর এখানে উৎখনন-কার্য রহিত করা হয়। তখন বিশ্বাস করা হয় যে এই নগরীর তলদেশে মনুষ্যবসতির আর কোন নিদর্শন নেই। এই বিশ্বাস নস্যাৎ করেন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. এফ. ডেলস্ যখন লাহোরের ইণ্ডাস্ ভ্যালী কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সহায়তায় এখানে টেস্ট বোরিং (test boring) করেন। এই টেস্ট বোরিং-এর ফলে জানতে পারা যায় যে প্রকাশমান জলতলের ৩৯ ফুট' নীচেও মনুষ্যবসতি ছিল।

॥ তিন ॥

হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোয় যখন উৎখনন চলছিল তখন (১৯২৭-৩১) ননীগোপাল মজুমদার সিন্ধুনদের তটে সমকালীন ও তৎপূর্বের বহুসংখ্যক মনুষ্যবসতির কেন্দ্র আবিষ্কার করেন। তার মধ্যে ননীগোপাল কর্তৃক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎখনিত আমরির

আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আমরির আবিষ্কারই প্রথম প্রমাণ করে যে সিন্ধু সভ্যতা কোন নামগোত্রহীন সভ্যতা ছিল না। প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার চরম পরিণতি মাত্র।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্যার অরেল স্টাইন সিন্ধু উপত্যকার মধ্যাংশে বাহওয়ালপুরের (Bahawalpur) নিকট ঘগগ্‌র-হাকরার শুষ্ক খাতে হরপ্পা-সংস্কৃতির অসংখ্য কেন্দ্র আবিষ্কার করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্বাধীনতার শর্ত হিসাবে দেশ বিভাগ হয়, তখন এসব কেন্দ্রের অধিকাংশই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেজন্য ১৯৪৭-এর পর ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পাকিস্তানের পূর্ব-সীমান্তবর্তী ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে হরপ্পা-কৃষ্টির কেন্দ্রের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। তার ফলে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ও গুজরাটে হরপ্পা-কৃষ্টির বহু কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। তাদের মধ্যে কালিবঙ্গন, লোথাল ও রঙ্‌পুরে প্রণালীবদ্ধভাবে উৎখনন কার্য চালানো হয়েছে। এখন জানা গিয়েছে যে এসব কেন্দ্রও হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সমকালীন যুগের কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল। ১৯৬১-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে পশ্চিম বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উৎখনন দ্বারা বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতেও তাম্রাশ্ম সভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করে। ওদিকে পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহম্মদ শরিফ সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে ঘারো ডিরোতে হরপ্পা-সংস্কৃতির বহু কেন্দ্র আবিষ্কার করেন। উত্তর দিকেও ডক্টর এ. এচ. দানি শুলেমান পর্বতমালার পাদমূলে অনেকগুলি বসতির সন্ধান পান। তার মধ্যে গুমলা ও রহমন ধেরি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই আবিষ্কারের ফলে এখন জানা গিয়েছে যে রূপার (Rupar) হরপ্পা-সংস্কৃতির উত্তরতম সীমা ছিল না। হরপ্পা-সংস্কৃতি গুমলা ও রহমন ধেরি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে এর সীমা ছিল আরব সাগর পর্যন্ত। আরও জানা গিয়েছে যে এ সভ্যতা বেলুচিস্তানের পর্বতমালাকে অতিক্রম করেনি। মাত্র পার্বত্য সীমান্তে স্থলপথে বাণিজ্যের জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ ছিল (যথা মুলা নদীর তটে অবস্থিত পাঠানি ডামব, বোলান গিরিপথে অবস্থিত গুদরি, লোরালাই উপত্যকায় অবস্থিত ডাবর কোট ও কাওনরি এবং দক্ষিণ আফগানিস্তানে ও উত্তর বেলুচিস্তানে (ঝোব উপত্যকায় যে প্রাচীন যোগাযোগের পথ ছিল তার ওপর অবস্থিত পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই) সীমাবদ্ধ ছিল।[৭]

আবিষ্কৃত তথ্যের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন জগতে যেসব সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তাদের মধ্যে হরপ্পা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলই সবচেয়ে বৃহৎ ছিল। এ সম্বন্ধে পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এম. রাফিক্ মুঘল ১৪৪টি কেন্দ্রের নাম করেছেন। যথা—

(১) মুনড্রা, (২) নবিনাল, (৩) মাডেভা, (৪) টৌডিও, (৫) নলিয়া, (৬) আজর, (৭) কোটাডা, (৮) বুঞ্জ, (৯) কোটাডা ভাদলি, (১০) নাকটারনা, (১১) দেশলপুর, (১২) নরপা, (১৩) ভাদা ভিগোডি, (১৪) লাখাপট, (১৫) জুনা, (১৬) বম্নি, (১৭) কোটারা (১৮) নেম্নু-নি-ধর, (১৯) কোটাডি, (২০) মরুও, (২১) কেরসি, (২২) সুরকোটাডা, (২৩) সেলারি, (২৪) রূপার, (২৫) পাবুনাথ, (২৬) লাখাপার, (২৭) কণ্ঠকোট, (২৮) খারি-কা-ডাণ্ডা, (২৯) পীরওয়াড়া খেতর, (৩০) ঝাঙ্গর, (৩১) ফজা, (৩২) লাখাবায়াল, (৩৩) আমরা, (৩৪) গপ্, (৩৫) কিণ্ডনারেখেরা, (৩৬) সোমনাথ, (৩৭) কানজেটার, (৩৮) বেনিয়াবাদার, (৩৯) রোজডি, (৪০) আডকোট, (৪১) ভীমপাটল, (৪২) বাবরকোট, (৪৩) রঙ্পুর, (৪৩) দেবালিয়ো, (৪৫) চাচানা, (৪৬) গনি, (৪৭) পানসিনা, (৪৮) লোথাল, (৪৯) কোঠ, (৫০) নানা সুতারিয়া, (৫১) মেহগাম, (৫২) টেলড, (৫৩) ভগৎরাও, (৫৪) ঘারো ভিরো, (৫৪) কালিবঙ্গন, (৫৬) আমিলানো, (৫৭) পীর শাহ, জুরিও, (৫৮) নেলবাজার বা আল্লাদিনো, (৫৯) গথ হাসান আলি, (৬০) বালাকোট, (৬১) গুজো, (৬২) সোটকা কো, (৬৩) ডাশট্, (৬৪) সুটকাজেন-ডোর, (৬৫) শাহজো, (৬৬) করচাত, (৬৭) ঢাল, (৬৮) আমরি, (৬৯) চান্নুধারো, (৭০) ডামব বুবি, (৭১) গোরাণ্ডি, (৭২) গাজী শাহ, (৭৩) লোহরি, (৭৪) আলি মুরাদ, (৭৫) পাণ্ডি ওয়াহি, (৭৬) লহুমজোদারো, (৭৭) জুডিরজো-দারো, (৭৮) পাঠানি ডামব্, (৭৯) গাণ্ড ডামব্, (৮০) কিরতা, (৮১) কোয়েটা মিরি, (৮২) কাওনরি, (৮৩) ডাবর কোট, (৮৪) পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, (৮৫) রহমন ধেরি, (৮৬) গুমলা, (৮৭) কাটপালোন, (৮৮) নগর, (৮৯) রূপার, (৯০) বরা, (৯১—১১০) বিকানীরের ২০টি কেন্দ্র, (১১১—১৩৫) ঘগ্গর, হাকরার শুষ্ক খাতে ২৫টি কেন্দ্র, (১৩৬) কোটাস্থর, (১৩৭) বৈনিওয়াল, (১৩৮) আলমগীরপুর, (১৩৯) মহেঞ্জোদারো, (১৪০) কোটদিজি, (১৪১) হরপ্পা, (১৪২) চাক পুরবানে সইয়াল, (১৪৩) ঝুকর, (১৪৪) নারু-ওয়ারো-দারো। অবশ্য, এই ১৪৪টি কেন্দ্রের তালিকায় বাহাওয়ালপুর, পূর্ব

পাঞ্জাব, গুজরাট ও বেলুচিস্তানের শিবি জেলার কয়েকটি কেন্দ্রের নাম যুক্ত করা হয়নি। আরও তালিকাটি ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করা হয়েছিল। তারপরে হরপ্পা সভ্যতার আরও কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের সব কেন্দ্রসমূহেরও নাম যুক্ত করা হয়নি।

॥ চার ॥

হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে একটা কথা এখানে বলা দরকার। অধিকাংশ কেন্দ্রেই আমরা হরপ্পা সভ্যতার যে-নিদর্শন পেয়েছি, তা হরপ্পা সভ্যতার পরিণত দশার (mature stage) সভ্যতা। হরপ্পা, কোটদিজি, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানে উৎখননের ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে এসব স্থানে উৎখনিত পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার নীচের তলার স্তরে (অনেকে একে আদি-হরপ্পা সভ্যতা বলবার পক্ষপাতী।) প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতারও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সেজন্য অনুমান করা হয়েছে যে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলেই হরপ্পা সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল। এক কথায় পরবর্তীকালের আর্যসভ্যতার ন্যায় হরপ্পা সভ্যতা কোনও আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। দেশজ সভ্যতার বিবর্তনমূলক পরিণতিতেই হরপ্পা সভ্যতা সৃষ্ট হয়েছিল। শুধুমাত্র তাই নয় এই দেশজ সভ্যতা পশ্চিমে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান ও পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হরপ্পীয় সভ্যতাকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব ছিল গ্রামীণ সভ্যতা। চতুর্থ পর্বেই হরপ্পা সভ্যতা নাগরিক রূপ ধারণ করে। এটাই হরপ্পা সভ্যতার পরিণত (mature) পর্বের সভ্যতা। এই পর্বেই হরপ্পা সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। পঞ্চম পর্ব ছিল হরপ্পা সভ্যতার অবনতি বা পতনের পর্ব। বলা বাহুল্য, হরপ্পা সভ্যতার প্রথম তিন গ্রামীণ পর্বের সভ্যতাকেই আমরা 'প্রাক্-হরপ্পীয়' সভ্যতা বলি। আর চতুর্থ পর্বে যখন এ সভ্যতা নাগরিক রূপ ধারণ করেছিল এবং এর চরম বিকাশ ঘটেছিল, সেটাই প্রকৃত হরপ্পা সভ্যতা। আর পঞ্চম পর্বের সভ্যতাকে বলা হয় উত্তরকালীন হরপ্পা সভ্যতা।

সিন্ধু-

প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে পাকিস্তানের হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, আমরি ও কোটদিজিতে, ভারতের কালিবঙ্গান, সান্ধ-নওয়াল ও নাগওয়াড়াতে ; আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাঁকে ও বেলুচিস্তানের পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, কিলিগুল মহম্মদ, ডামব্ সাদাত, রানা ঘুণ্ডাই, আঞ্জিরা, পাণ্ডি ওয়াহি, শাহ ডামব্ কুল্লি ইত্যাদি স্থানে।

পূর্ব ও দক্ষিণ বেলুচিস্তান ও দক্ষিণ আফগানিস্তানে যে সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তা ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের প্রাক্-হরপ্পীয় গ্রামীণ সভ্যতার এক আঞ্চলিক সংস্করণ মাত্র। এখানে প্রাদুর্ভূত প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার প্রথম দশার লোকদের বৃত্তি ছিল পশুপালন ও সীমিত পরিমাণ ভূমিকর্ষণ। এই দশার লোকেরা গোরু, মেষ ও ছাগল পালন করত ও সীমিত পরিমাণে দানাশস্য উৎপাদন করত। তারা পাথরের তৈরী ছুরির ফলা, বাটালি ও বানমুখ তৈরি করত। হাড়ের তৈরী সুঁচও তৈরি করত। এছাড়া তারা হাতে-তৈরী মৃৎপাত্র ও মেঝের ওপর পাতবার জন্য চাটাই তৈরি করত। অদগ্ধ, রোদে শুকোনো ইট দিয়ে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করত এবং রান্নার জন্য ঘরের ভিতরে উনুন তৈরি করত। এই দশার বয়স নির্ণীত হয়েছে ৩৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। এই দশার কৃষ্টির নিদর্শন আমরা পাই দক্ষিণ আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাকে ও উত্তর বেলুচিস্তানের কিলিগুল মহম্মদে, রানা ঘুণ্ডাইয়ে. সুরজঙ্গল ও ডাবর কোটে, ও ঝোব উপত্যকার পেরিয়ানো ঘুণ্ডাইয়ে এবং আঞ্জিরায়। ভারতের মেসোলিথিক যুগের কৃষ্টির সঙ্গে এই কৃষ্টির যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় দশার লোকেরা আরও উন্নত মানের কৃষ্টির অধিকারী ছিল। তাদের মধ্যে পশুপালন ও কৃষির অগ্রগতি ঘটেছিল। কাদামাটির ইট ও পাথর দিয়ে তারা আরও বড় রকমের ঘরবাড়ি তৈরি করত। স্থায়ী গ্রামীণ জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তারা বাঁধ নির্মাণ করত ও তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে তামার ব্যবহারের প্রচলন ছিল। মৃৎপাত্র তারা হাতে এবং চক্রে, দু'ভাবেই তৈরি করত। কালোর ওপর লাল চিত্রিত বাটি, এবং পায়া-বিশিষ্ট পাত্র তৈরি করত। পাত্রগুলির ওপর অঙ্কনের বিষয়বস্তু ছিল সারিবদ্ধ বন্যছাগ, কুকুদ-বিশিষ্ট এবং কুকুদবিহীন বলদ, ও নানা প্রকার জ্যামিতিক
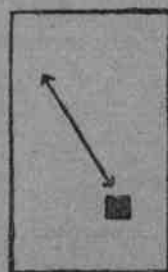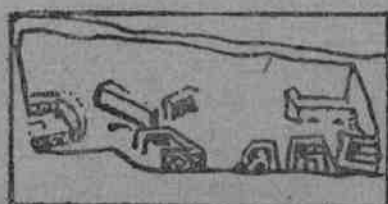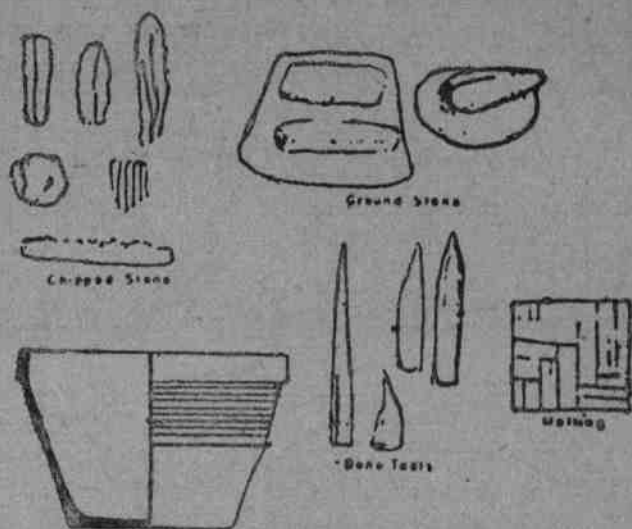
প্রথম দশার প্রত্নদ্রব্য

নক্‌শা। নানারকম অন্ত্যেষ্টি দ্রব্যের সঙ্গে মৃত ব্যক্তিকে তারা বাড়ির মধ্যেই সমাধি দিত। গোরু, ছাগল, মেষ ইত্যাদি তারা আধুনিক রীতিতেই পালন করত। যেসব জায়গায় প্রথম দশার কৃষ্টির
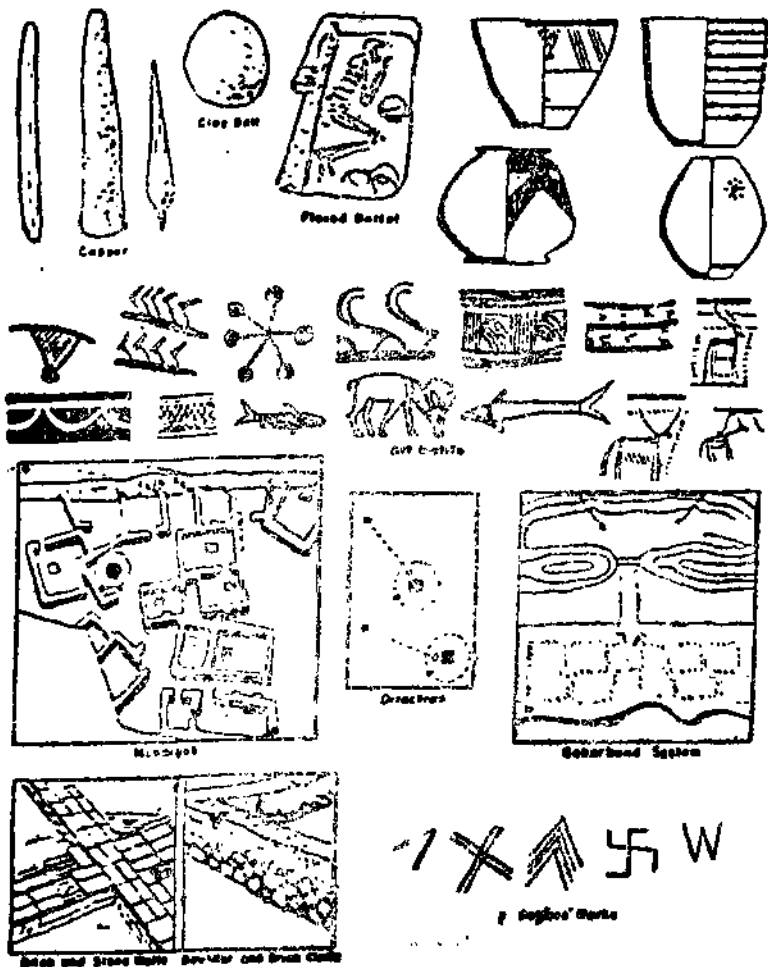
দ্বিতীয় দশার প্রত্নদ্রব্য

প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, সেই সব জায়গাতেই দ্বিতীয় দশার কৃষ্টির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় দশার বয়সকাল ধরা হয়েছে ৩৩০০ থেকে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

তৃতীয় দশায় কৃষিজমির পূর্ণ ব্যবহার করা হত। এই দশার লোকেরা তামা ও ব্রোঞ্জনির্মিত নানাপ্রকার দ্রব্য নির্মাণ করত। পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তি ও বলদের মূর্তিও এ যুগে প্রচুর পাওয়া গিয়েছে। মৃৎপাত্রের ওপর চিত্রিত নক্‌শাগুলি মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় দশার মৃৎপাত্রের নক্‌শারই অনুরূপ। জ্যামিতিক নক্‌শাগুলি আরও

তৃতীয় দশার প্রত্নদ্রব্য

আড়ম্বরপূর্ণ। মৃৎপাত্রের ওপর এখন আমরা অঙ্কিত হতে দেখি অশ্বত্থ পাতা, কুকুদবিশিষ্ট বলদ, কেউটে সাপ, পাখি, মাছ ইত্যাদি। বোধ হয় অঙ্কিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল। সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে যে তাদের সংযোগ ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ

পাওয়া যায়। এ যুগেই আমরা আমরিতে দরজাবিহীন বহুকক্ষে বিভক্ত বাড়ি নির্মাণ করতে দেখি। কোটদিজিতেও আমরা এ-যুগে দুর্গ-নির্মাণের নিদর্শন পাই। বস্তুত এ-যুগে আমরা পূর্বদিকে রাজস্থান পর্যন্ত বসতিস্থাপনের নিদর্শন পাই। এ-যুগেই একটা অঞ্চলীকরণ প্রণালীর সূচনার আভাস পাওয়া যায়। এ-যুগের কৃষ্টির মধ্যে আমরা হরপ্পীয় সভ্যতার অনেক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। এর সময়কাল হচ্ছে ২৫০০ থেকে ২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

চতুর্থ দশায় আমরা প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতাকে নাগরিক রূপ গ্রহণ করতে দেখি। ভারতের মধ্যে কালিবঙ্গানের যে স্তরে হরপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, ঠিক তার নীচের স্তরেই আমরা প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। এখানকার লোকেরা গোড়া থেকেই প্রাকার-বেষ্টিত গ্রামে বাস করত। দুর্গ নির্মাণের জন্য যে আকারের (৩০×২০×১০ সেন্টিমিটার) ইট ব্যবহার করত, ঠিক সেই আকারের অদগ্ধ ইট দিয়েই তারা ওই প্রাকার-বেষ্টিত গ্রামের মধ্যে ঘরবাড়ি তৈরি করত। যদিও ঘরবাড়ি তৈরির জন্য অদগ্ধ ইট ব্যবহৃত হত, তা হলেও পয়ঃপ্রণালীর গাঁথনিতে দগ্ধ ইটই ব্যবহার করত। বাড়িগুলি সাধারণত একতলা এবং তিন-চার কামরাবিশিষ্ট হত এবং মাঝখানে একটা উঠান থাকত। রান্নার জন্য ঘরের মেঝেতেই উনুন তৈরি করা হত। উনুনগুলি দু-রকমভাবে নির্মিত হত—মেঝের ওপরে ও নীচে। উনুনগুলি মাটি দিয়ে নিকানো হত। একটা লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে চুনকাম করা বেলনাকার (cylindrical) গর্তের অস্তিত্ব। অনুমান করা হয়েছে এগুলি পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হত। এই যুগের মৃৎপাত্রগুলিকে A,B,C,D,E ও F শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। E শ্রেণীর পাত্রগুলি বাদামী রঙের, F-শ্রেণীরগুলি ধূসর রঙের, তবে এই শ্রেণীর পাত্রের সংখ্যা খুবই কম। A-শ্রেণীর পাত্রগুলি বাকী সব শ্রেণীর পাত্র থেকে স্বতন্ত্র। এরই সংখ্যা সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি। পাত্রগুলি চক্রেই তৈরি করা হত, কিন্তু সেগুলি নিপুণ নির্মাণ-দক্ষতার ছাপ বহন করত না। কেননা, তার ধারগুলি অত্যন্ত এবরো-খেবরো। পাত্রগুলির গাত্র লাল থেকে গোলাপী রঙের, কিন্তু কালো রঙে চিত্রিত, যদিও মাঝে মাঝে শাদা রঙের চিত্রণও আছে। মাত্র পেটের উপরের

অংশই চিত্রিত হত। চিত্রাঙ্কনগুলি সবই জ্যামিতিক। পাত্রগুলি নানা আকারের। একটি পাত্রের খুড়ো আছে, আর একটির মাত্র মুখে একটি ফুটো। B-শ্রেণীর পাত্রগুলিও চক্রে নির্মিত এবং এগুলি নির্মাণ-দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দেয়। পাত্রগুলি গলা পর্যন্ত চিত্রিত, লাল রঙের গায়ের ওপর কালো রঙের চিত্রাঙ্কন দ্বারা। চিত্রাঙ্কনগুলি ফুল ও পশুপক্ষী-সম্পর্কিত। এই শ্রেণীর পাত্রগুলি

পরিণত হরপ্পা যুগের প্রত্নদ্রব্য
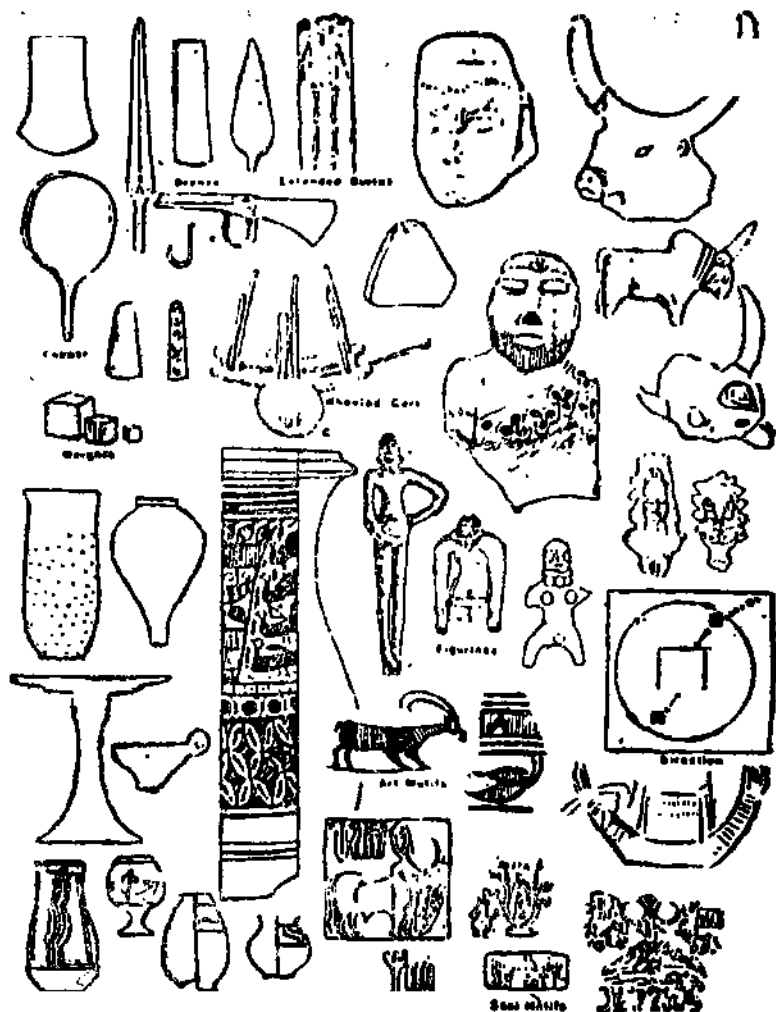
'জার' (Jar) আকারের। C-শ্রেণীর পাত্রগুলি মিহি মাটি দিয়ে বেশ পরিষ্কারভাবে তৈরি করা হত এবং হরপ্পার দুর্গ-প্রাকারের নীচে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের মত লাল থেকে ঘোর লাল রঙের। এই শ্রেণীর পাত্রগুলির ওপর জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কিত আছে। আকারে এগুলি বটিকাকার (globular)। D-শ্রেণীর পাত্রগুলিও লাল রঙের, এবং আকারে 'জার' ও গামলার মত। গামলাগুলির অভ্যন্তরে নানা প্রকার নক্শা কাটা থাকত এবং বাইরের অংশে সুতা দিয়ে দাগ কাটা হত। আকারে ও নক্শায় এগুলি আমরিতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

অন্যান্য যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখনীয় মুল্যবান পাথরের তৈরী ছুরির ফলা (কোনও কোনটি করাতের মত দাঁতবিশিষ্ট), পুঁতির গুটিকা, নরম পাথরের চাকতি, পোড়ামাটির ও মূল্যবান পাথরের অন্যান্য দ্রব্য, তামার ও পোড়ামাটির তৈরী হাতের চুরি ও বালা, শাঁখা ও রুলি, ছেলেদের খেলনার গাড়ি, বলদ, অস্থিনির্মিত ফুটো করবার যন্ত্র (Point) ও একটি তাম্র-নির্মিত বিচিত্র কুঠার।

কালিবঙ্গানের প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার হচ্ছে গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একখণ্ড কর্ষিত ভূমি। হরপ্পা যুগের নগর প্রাকারের বাইরে আজ পর্যন্ত যেখানে যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে, তার মধ্যে এটাই হচ্ছে প্রাচীনতম কর্ষিত ভূমির নিদর্শন। এখানে ছোলা, মটর ও সরিষার চাষ করা হত। ওখানে কোন লাঙ্গল পাওয়া যায়নি। দানাশস্যও পাওয়া যায়নি। সেজন্য অনুমান করা হয়েছে যে বর্ষার শেষে প্লাবন অপসারিত হলে হেমন্তকাল থেকে কৃষিকর্ম আরম্ভ করা হত এবং রবিশস্যই উৎপাদন করা হত। কালিবঙ্গানের প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব কাল ধরা হয়েছে ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে। রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষাতেও এর বয়সকাল নির্ণীত হয়েছে ২৪৫০-২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

কোটদিজি, আমরি ও কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের (নীচে তালিকা দেওয়া হল।) প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শনসমূহ থেকে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সভ্যতার একই ধরনের অর্থ নৈতিক ভিত্তি ছিল, যদিও তাদের মধ্যে কিছু কিছু আঞ্চলিক

বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছিল। এ সম্পর্কে পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮ দ্রষ্টব্য।

নীচে প্রাক্-হরপ্পীয় কৃষ্টিকেন্দ্রগুলির তালিকা দেওয়া হল :—

১। আফগানিস্তানে—মুণ্ডিগাক।

২। বেলুচিস্তানে—পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, কিলিগুল মহম্মদ, ডামব সাদাত, রানা ঘুণ্ডাই, টোগাউ, শাহ ডামব, আঞ্জিরা, নাল, নুনদারা, কুল্লি, গাজি শাহ, কোটরাশ, পাণ্ডি ওয়াহি।

৩। পাকিস্তানে—হরপ্পা, আমরি ও থমাঞ্জো বুথি থাররো, কোটদিজি ঘগ্‌গর-হাকরার শুষ্ক খাত।

৪। ভারতে— কালিবঙ্গান, সান্ধনওয়াল, রাজস্থানের মরু-অঞ্চল, গুজরাটে নাগওয়াড়া। (লোথালে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।)

আমরা আগেই বলেছি যে উৎখননের ফলে মার্টিমার হুইলার হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে পরিণত হরপ্পা সভ্যতার স্তরে দুর্গ-প্রাকার আবিষ্কার করেছিলেন। হরপ্পীয় দুর্গ-প্রাকারের নীচের স্তরেও উৎখনন চালানো হয়েছিল। এই উৎখননের ফলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯১টি প্রাক্‌হরপ্পীয় মৃৎপাত্রের খণ্ডিত টুকরা ও অন্যান্য বস্তু পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর এফ. এ. খান কোটদিজিতে যে উৎখনন করেছিলেন, তা মার্টিমার হুইলার কর্তৃক ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হরপ্পার প্রাক্ দুর্গ স্তরের বস্তুর চারিত্রিক গঠন সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। কোটদিজিও দুর্গপ্রাকার বেষ্টিত সুরক্ষিত নগর ছিল। এখানে হরপ্পা যুগের পরিণত সভ্যতার নীচের স্তরে (তার মানে দুর্গ-প্রাকারের নীচের স্তরে) ১৬ ফুট পুরু মনুষ্যবসতির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। এখান থেকেও প্রচুর পরিমাণ মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে, যার সঙ্গে হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রাক্-দুর্গ যুগের মৃৎপাত্রের সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া পোড়ামাটির তৈরী এমন অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি হরপ্পার পরিণত দশার সভ্যতার স্তরে প্রাপ্ত অনুরূপ দ্রব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। কোটদিজির দুর্গ নগরীর উপরে ও নিয়ে (এর নীচে আরও দু'টি স্তর ছিল) প্রাপ্ত দ্রব্যের যে রেডিয়ো-কার্বন-১৪ তারিখ নির্ণীত হয়েছে, তা হচ্ছে ২৬০৫ + ১৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ও ২০৯০ + ১৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (পেন-

সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের Museam Applied Centre for Archaeology প্রবর্তিত MASCA পদ্ধতি অনুযায়ী তারিখদুটি যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৫৫ ও ২৫৯০)। প্রাকার-বিশিষ্ট দুর্গনগরীর বাইরের এলাকায় উৎখননের ফলে যে সকল প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গিয়েছে তার তারিখ হচ্ছে ২৩৩৫ + ১৫৫ থেকে ২২৫৫ + ১৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (MASCA factor যুক্ত তারিখ ২৮৮৫ ও ২৮০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এ তারিখটা হচ্ছে সুমেরের রাজা প্রথম সারগনের (খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৩৪-২২৭৯) সমসাময়িক। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত সাতটি প্রত্নদ্রব্যের রেডিয়ো-কার্বন-১৪ তারিখ হচ্ছে ২০৮৩ + ৬৬ থেকে ১৭৬০ + :১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকে মহেঞ্জোদারোর প্রাচীনতম স্তর থেকে যে মৃৎপাত্র আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলি হরপ্পার মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ বহন করে। আরও উল্লেখনীয় যে মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন স্তরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র বেলুচিস্তানের কোয়েটা উপত্যকায় অবস্থিত ডামব সাদাত-এর প্রথম ও দ্বিতীয় দশার মৃৎপাত্রের সাদৃশ্যযুক্ত। তবে সবগুলিরই বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ হচ্ছে কোটদিজির মৃৎপাত্রের অনুরূপ। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কোটদিজির সভ্যতা একেবারে নিঃসঙ্গ সভ্যতা ছিল না। সিন্ধু উপত্যকা ও কোয়েটা উপত্যকার প্রাক্-হরপ্পীয় কৃষ্টিসমূহ পরস্পর জ্ঞাতিত্বসম্পন্ন ছিল। কিন্তু এই জ্ঞাতিত্ব উত্তর ও মধ্য বেলুচিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেটাই ছিল পশ্চিম দিকে প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার প্রান্তিক সীমানা। কোটদিজির লক্ষণযুক্ত মৃৎপাত্র ও অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য সিন্ধু উপত্যকার ৩০টি জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। তবে এই সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এদিকে ১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও পাকিস্তান সরকারের যুগ্ম উদ্যোগে মহেঞ্জোদারোতে আবার খননকার্য চালানো হয়। মূলকেন্দ্রে উৎখনন ছাড়া মহেঞ্জোদারো নগরীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত মাটি থেকে ৩৫ ফুট উচ্চ এক অঞ্চলেও খননকার্য চালানো হয়। এখানে ড্রিল দ্বারা উৎখননের ফলে জানা গিয়েছে যে মহেঞ্জোদারো নগরীর বসতিপূর্ণ স্তরের ঘনত্বের মোট উচ্চতা ছিল ৭৪ ফুট বা প্রায় সাত তলা। একেবারে নীচের ১৪ ফুট জলতলের জন্য উৎখনন করা সম্ভবপর হয়নি। ওই

উৎখনিত গহ্বর থেকে প্রতি ছ'ফুট অন্তর স্তর থেকে প্রত্নদ্রব্য তুলে আনা হয়েছে। এই সকল প্রত্নদ্রব্যের রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে যে আগে মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার ভিত্তিতে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার প্রাদুর্ভাবকাল যা অনুমিত হয়েছিল, তা মোটামুটিভাবে ঠিকই। তবে নগরীদু'টি তুলনামূলকভাবে যে কবে পরিত্যক্ত হয়েছিল তা এখনও পর্যন্ত অজানা রয়ে গিয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

এছাড়া সিন্ধুসভ্যতার সন্ধানে অনেকগুলি নূতন জায়গাতেও খননকার্য ব্যাপকভাবে চালানো হয়েছে। যথা ১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে বি. বি. লাল ও বি. কে. থাপার কর্তৃক কালিবঙ্গানে, ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে সুরজভান কর্তৃক মিঠায়াল ও শিশওয়ালে, ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এফ. এ. খান ও এম. এ. হালিম কর্তৃক তক্ষশিলায়, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে এ. এইচ. দানি কর্তৃক গোমল উপত্যকায় অবস্থিত গুমলায়, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে এম. রফিক মুঘল কর্তৃক মধ্য-সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত জলিলপুরে, ১৯৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে জে. পি. যোশী কর্তৃক কচ্ছের 'রান-এর দক্ষিণে, ও ১৯৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দে জে. এম. কাসাল কর্তৃক আমরিতে। আমরিতে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যের রেডিয়ো-কার্বন-১৪ তারিখ নির্ণীত হয়েছে ২৬৭০ + ১১১ ও ২৯৫০ + ১১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (MASCA factor যুক্ত তারিখ হচ্ছে ৩৩২০ ও ৩৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এসব রেডিয়ো-কার্বন-১৪ তারিখ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কোটদিজির চেয়েও প্রাচীন প্রাক্-হরপ্পীয় কৃষ্টির কেন্দ্র সিন্ধু উপত্যকা ও ভারতের অন্যত্র ছিল। এ সকল প্রাক্-হরপ্পীয় কৃষ্টিকেন্দ্রের অন্যতম হচ্ছে কালিবঙ্গান—সেখানকার উপরের স্তরে পাওয়া গিয়েছে পরিণত হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন। কালিবঙ্গানের পরিণত হরপ্পা সভ্যতার ঠিক নীচের স্তরেই পাওয়া গিয়েছে এমন সব মৃৎপাত্র, যেগুলি হরপ্পার প্রাক্-দুর্গ যুগের ও কোটদিজির মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ বহন করে। উল্লেখনীয় যে কালিবঙ্গানে এক প্রকার মৃৎপাত্র (লালের ওপর সাদা ও কালো চিত্রাঙ্কন) পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি

'সোথি' কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 'সোথি' কৃষ্টির রেডিয়ো-কার্বন-১৪ তারিখ হচ্ছে খ্রীঃ পূ: ২১২৫ থেকে ২৯২০ পর্যন্ত। কোটদিজির বৈশিষ্ট্য-যুক্ত যে সকল মৃৎপাত্র গুমলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে পাওয়া গিয়েছে, তা হরপ্পার নীচের স্তরেও পাওয়া গিয়েছে। তার রেডিয়ো-কার্বন-১৪ তারিখ হচ্ছে ২২৪৮ + ৭৪ (বা MASCA factor যুক্ত তারিখ হচ্ছে ২৭৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এখানে উল্লেখনীয় যে এই সব প্রাক্-হরপ্পীয় কেন্দ্রসমূহে কোথাও কোথাও পরিণত হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নদ্রব্যও পাওয়া গিয়েছে। আবার কোথাও কোথাও তার অভাবও লক্ষিত হয়। তা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে হরপ্পা, কালিবঙ্গান, গুমলা, কোটদিজি. ও আমরি প্রভৃতি স্থানে পরিণত হরপ্পা সভ্যতার বাহকরাই পরবর্তীকালে এসে বাস করেছিল, এবং জলিলপুর, সরাইখেদা প্রভৃতি স্থান তারা পরিত্যাগ করেছিল। এ সম্পর্কে লক্ষণীয় যে বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকার পূর্বকালীন কোটদিজি কৃষ্টির কেন্দ্রসমূহের আঞ্চলিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও মৃৎপাত্রসমূহের নির্মাণ-রীতির মধ্যে একটা ঐক্য ছিল। তাছাড়া, ওই সব কেন্দ্রের কোনও কোনও স্থানে (যথা কালিবঙ্গান, কোটদিজি, আমরি, কোটরাশ, বুথি. পোখরান প্রভৃতি স্থানে আমরা ওই যুগেই দুর্গ-নির্মাণের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করি। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে ওই সব জায়গায় একটা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ঘরবাড়ি নির্মাণ সম্পর্কিত স্থাপত্য রীতিরও আমরা একটা স্থায়িত্ব লক্ষ্য করি। একই জায়গায় বসবাস ও বহুকক্ষবিশিষ্ট বাসস্থানের ক্রমিক বিবর্তন দ্বারা এটা সূচিত হয়। বলদ, পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তি, ছেলেদের খেলনার গাড়ি, এবং চক্রের ব্যবহার, বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগের বিদ্যমানতা ও পারস্পরিক কৃষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও সূচিত করে। সরাইখেদা, জলিলপুর ও পাণ্ডি ওয়াহি ইত্যাদি স্থানে উত্তর আফগানিস্তানে লভ্য ল্যাপিস ল্যাজুলির (lapis lazuli) উপস্থিতি দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য বা বিনিময়ের ইঙ্গিত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হরপ্পা সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের বহু পূর্ব থেকে বিভিন্ন স্থানে ঐক্যবদ্ধ এমন একটা কৃষ্টি ছিল, যার মধ্যে হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদানসমূহ বর্তমান ছিল। সেই সকল উপাদান নিয়েই খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্রকে

হরপ্পার নগর-সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে প্রাক্-হরপ্পীয় গ্রামীণ সভ্যতা নগর-সভ্যতায় পরিণত হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়াটা এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। কেননা, প্রাক্-হরপ্পা যুগের যেসব কৃষ্টিকেন্দ্র আমরা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, সেসব কেন্দ্রে হরপ্পা-সমাজের দুটি জিনিসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, বৃহদাকার নগরবিন্যাস ও দ্বিতীয় শিল্পক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার অনুপস্থিতি যথা সীলমোহরের ওপর অঙ্কন লিখন, ভাস্কর্য, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি।

॥ ছয় ॥

সিন্ধুনদের বন্যাপ্লাবিত পলিজ অঞ্চলে বা যেখানে স্থায়ী জলের উৎস ছিল সেই সব অঞ্চলে আদি ও পরিণত হরপ্পা সভ্যতার বিদ্যমানতা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়—যে পরিবেশ জমির পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা এক বৃহৎ জনতার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতা কিভাবে পরিণত নাগরিক সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল তার উত্তর এ থেকে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়েছে এটা কি বেলুচিস্তানের লোকেদের অভিগমনের ফলে ঘটেছিল? তা হলে ধরে নিতে হয় যে সিন্ধু উপত্যকার নাগরিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ পশ্চিম দিক থেকে ঘটেছিল। এ সম্বন্ধে সি. সি. কারলোৎস্কা বলেছেন যে এটা বাণিজ্যঘটিত আদান-প্রদানের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ঘটেছিল। এর সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হরপ্পার প্রাক্-নাগরিক যুগের লোকেরা যে দূরদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বা বিনিময়ে নিযুক্ত ছিল সেটা ল্যাপিস্ ল্যাজুলির (lapis lazuli) উপস্থিতি থেকেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু একটা গ্রামীণ সভ্যতা কীভাবে এক বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী নাগরিক সভ্যতায় বিবর্তিত হয়েছিল, তা প্রমাণ করবার জন্য আরো প্রত্নতাত্ত্বিক ও পরিবেশঘটিত প্রমাণের প্রয়োজন। সেরূপ কোন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এখন পর্যন্ত

যে প্রমাণ আছে, তা থেকে আমরা এইমাত্র বলতে পারি যে হরপ্পা সভ্যতা হঠাৎই রাতারাতি এক পরিণত নাগরিক-সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল। সেজন্য প্রশ্ন করা হয়েছে এটা কি কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় ঘটেছিল? কিন্তু সেটাও প্রমাণসাপেক্ষ। বস্তুত হরপ্পার পরিণত সভ্যতার আবির্ভূত হওয়া ও ওই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের পতন, এ দুটোই এমন আকস্মিক-ভাবে ঘটেছিল যে দুটো প্রশ্নেরই উত্তর আজ পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের নিকট এক বিরাট প্রহেলিকারূপ রহস্য রয়ে গিয়েছে।

॥ সাত ॥

আগের অনুচ্ছেদেই আমরা বলেছি যে অনেকে বলেন, হরপ্পার পরিণত নাগরিক-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল দূরদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-ঘটিত যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে। এ-সম্বন্ধে মেসেপোটেমিয়া বা সুমেরের কথাই বলা হয়। কেননা, সিন্ধু সভ্যতার কিছু সীলমোহর ও অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য সুমেরেও পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া খ্রীষ্টপূর্ব ২১২০ থেকে ১৯০০ অব্দের মধ্যে সুমেরের লোকেরা যে দূরদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত তা সুমেরের বহু ধর্মীয় লিখিত বিবরণীর মধ্যে লেখা আছে। পণ্ডিতমহলের গবেষণার ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে সুমেরের লোকেরা বিশেষ করে তিনটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। এ তিনটি দেশ হচ্ছে (১) ডিলমুন (Dilmun), (২) মগন (Magan), ও (৩) মেলুহা (Meluha)। এই তিনটির মধ্যে ডিলমুন ও মগনকে পণ্ডিতমহল যথাক্রমে বাহরিন (Bahrein) দ্বীপ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের সঙ্গে সনাক্ত করেছেন। কেবল মেলুহাকে সনাক্ত করতে পারেন নি। প্রথম দুটি স্থানের অবস্থান থেকে মনে হয় যে সিন্ধুসভ্যতা-অধ্যুষিত অঞ্চলই মেলুহা। কেননা, মেলুহা নামের সঙ্গে মলয় শব্দের একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, এবং আলেকজাণ্ডার ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারত আক্রমণের সময় মলয়দের জনপদ পাঞ্জাবে দেখেছিলেন।

এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সি. জে. গাড (C. J. Gadd) সুমেরের উর (Ur) নগরীতে কয়েকটি সীলের সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলের সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। এখন বাহরিন, ফাইলাক ও পারস্য উপসাগরের আরববর্তী উপকূলের কয়েকটি জায়গা থেকে আরও সীল আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি সুমেরীয়ও নয়, সিন্ধু সভ্যতারও নয়। সিন্ধু সভ্যতার সীলগুলির সঙ্গে এই সীলগুলির একটা স্বতন্ত্রতা বা তফাত আছে। সিন্ধু সভ্যতার সীলগুলি চতুষ্কোণ, আর পারস্য উপসাগরে প্রাপ্ত সীলগুলি গোলাকার। তবে পারস্য উপসাগরের উপকূলস্থ স্থানসমূহে যে গোলাকার সীল পাওয়া গিয়েছে তা যে ভারতে একেবারে দুর্লভ, তা নয়। চানুধারোর উত্তর-হরপ্পীয় যুগের স্তরে এবং লোথালের উপর দিকের স্তরেও পাওয়া গিয়েছে। পারস্য উপসাগরের উপকূলস্থ ও নিকট-প্রাচীর অন্যান্য দেশে আরও পাওয়া গিয়েছে চানুধারো ও লোথালের মত মালার গুটি (beads) ও মহেঞ্জোদারোর নরম পাথরের (steatite) পাত্র যার বাইরের দিকের গাত্রে এমন সব জন্তু জানোয়ারের চিত্র অঙ্কিত আছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্রকে ভারতের সঙ্গে নিকট-প্রাচীর দেশসমূহের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। এই বাণিজ্য জলপথ ও স্থলপথ এই উভয় পথেই সাধিত হত। এক কথায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে বাণিজ্যের দৌলতে বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকা, বেলুচিস্তান, ইরান, ও দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের সূচনা পর্যন্ত এই বাণিজ্য স্থলপথে সাধিত হত। কিন্তু তারপর এই বাণিজ্য জলপথে পরিচালিত হত। যখন এই বাণিজ্য স্থলপথে সাধিত হত, তখন সিন্ধু উপত্যকা, উত্তর বেলুচিস্তান, দক্ষিণ আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিয়ার মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ রকমের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কে সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলির ওপর খোদিত লিপিসমূহ বিশেষ আলোক-পাত করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এগুলির পাঠোদ্ধার আমরা আজ পর্যন্ত করতে পারিনি। লিপিগুলি পণ্ডিতমহলকে আজ পর্যন্ত আলেয়ার আলোর মত বিভ্রান্ত করেছে। বস্তুত লিপিগুলির

পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সিন্ধু সভ্যতার অনেক কিছু সমস্যাই আমাদের কাছে রহস্যাবৃত থেকে যাবে।

সিন্ধু সভ্যতার কয়েকটি কেন্দ্রের রেডিয়ো-কার্বন ও MASCA পরিশোধিত তারিখ দিয়ে আমি এ আলোচনা শেষ করছি—

স্থান	রেডিয়ো-কার্বন-১৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ তারিখ	MASCA পরিশোধিত খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ তারিখ
আমরি	২৯০০-২৭৭৩	৩৬৫০-৩২১০
কোটদিজি	২৬০৪-২০৯৩	৩৩৮০-২৮০০
কালিবঙ্গান	২৩৭১-১০০১	৩১১০-১৬০০
সোমনাথ	২৪৪৫-১৬১৫	৩১৬০-১৬৯০
গুমলা	২২৪৮-	২৯১০-২৬০০
হটালা	২২১৪-	২৮৫০-২৫৮০
লোথাল	২০৮২-১৫৫৭	২৮০০-১৬৪০
মহেঞ্জোদারো	২০৮০-১৭৫৮	২৬০০-১৯৬০
রোজড়ি	১৯৭৮-১০৪৮	২৫৫০-১৯৬০
সুরকোটাডা	২০৫৭-১৬৬৫	২১৯০-১৭৭০

মহেঞ্জোদারো সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত। লারকানা স্বাধীনতাপূর্ব যুগের নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের একটি ছোট ষ্টেশন। স্বাধীনতার পর এই রেলপথের নাম হয়েছে পাকিস্তান ওয়েসটার্ন রেলওয়ে।

১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসের এক গোধূলি-লগ্নে ট্রেন থেকে অবতরণ করলাম এই ছোট ষ্টেশনটিতে। জনবিরল ষ্টেশন। আমিই একমাত্র বাঙালি তরুণ যে সেদিন লম্বা পাড়ি দিয়েছিল সুদূর বাঙলা দেশ থেকে সিন্ধুপ্রদেশের লারকা জাতির নামে অভিহিত এই জেলাটিতে—এক রহস্যময়ী নগরীর হাতছানিতে।

এই রহস্যময়ী নগরীর নাম মহেঞ্জোদারো। সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার খয়েরপুর বিভাগে অবস্থিত। আমি যাবার মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে এই লুপ্ত নগরীর রহস্য একজন বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ উদ্ঘাটিত করেছিলেন। তিনি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেদিন বিজ্ঞানী মানুষ যদি এমন কোন যন্ত্রযান আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন, যার সাহায্যে মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হত প্রতি সেকেণ্ডে এক মাইল পথ অতিক্রম করা, তা-ও বিশ্বজনের মনে সেরূপ বিস্ময় উৎপাদন করত না, যা করেছিল বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কর্তৃক আবিষ্কৃত এই রহস্যময়ী নগরী।

এই রহস্যময়ী নগরী সমগ্র জগতের সামনে উপস্থাপিত করেছিল ভারতের ইতিহাসের এক বিচিত্র যুগের নিদর্শন। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা স্যার জন মার্শাল এই অজ্ঞাতপূর্ব সভ্যতার এক সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করলেন বিলাতের 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ' (২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) পত্রিকায়। নিদর্শনসমূহের চিত্রগুলি দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন সমগ্র বিশ্বের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা। নিকট প্রাচীর (বর্তমানে মধ্য-প্রাচীর) প্রত্নতত্ত্বাবিদ্‌গণের মধ্যে এক চাঞ্চল্যময় সাড়া পড়ে গেল। তাঁরা 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ'-এ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪; ৪ অকটোবর ১৯২৪) পালটা প্রবন্ধ লিখে অভিমত প্রকাশ করলেন

যে, সিন্ধুসভ্যতার ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি হচ্ছে মেসপোটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতা। অনুরূপ সুমেরীয় সভ্যতার ভিত্তিতে সিন্ধু উপত্যকায় উদ্ঘাটিত এই সভ্যতার বয়স নির্ণীত হল খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ।

বহুদিন ধরেই পণ্ডিতমহলে এটা স্বীকৃত হয়ে এসেছিল যে, আগন্তুক আর্যরা পঞ্চনদীর তীরে উপস্থিত হয়ে যে বৈদিক সভ্যতার পত্তন করেছিলেন, তার সবচেয়ে প্রাচীন কাল হচ্ছে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এখান থেকেই ভারতের ইতিহাস শুরু করা হত। সুতরাং সিন্ধুসভ্যতা এক নিমেষেই ভারতের ইতিহাসকে টেনে নিয়ে গেল আরও এক হাজার বৎসর পিছনে।

দুই

মহেঞ্জোদারো লারকানা রেল ষ্টেশন থেকে আনুমানিক বিশ মাইল দক্ষিণে, সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আবিষ্কারের পূর্বে এই রহস্যময়ী নগরী এক ঢিবির আকারে অবহেলিত ও অবগুণ্ঠিত অবস্থায় পড়ে ছিল। এই সভ্যতারই গোষ্ঠীভুক্ত অপর প্রতিভূ নগরী হচ্ছে পাঞ্জাবের মন্টোগোমেরি জেলায় অবস্থিত হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো থেকে অনেক উত্তরে ইরাবতী নদীর পূর্ব তীরে। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত যে সীলমোহরের সঙ্গে আমরা আজ সুপরিচিত, অনুরূপ একটি সীলমোহর উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে মেজর-জেনারেল আলেকজাণ্ডার কানিংহাম হরপ্পা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তার তাৎপর্য বহুদিন যাবৎ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। এমন কি রাখালদাস কর্তৃক মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হবার পাঁচ বছর আগেও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন অফিসার হরপ্পায় উপনীত হয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন যে এর বিশেষ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য নেই, কেননা ঢিবিটা হচ্ছে অর্বাচীন।

সুতরাং রাখালদাসই যে সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কারক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিরাট আবিষ্কারের জন্য মাত্র কয়েক বৎসর পরেই রাখালদাসকে শহীদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বশে একদল লোক রাখালদাসের বিরুদ্ধে এমন এক চক্রান্তের

সৃষ্টি করেছিল যে, রাখালদাস বাধ্য হয়েছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করতে। এটা ঘটেছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁকে সাদরে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন (১৯২৮) বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রফেসর অফ্ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কাল্চার'-এর চেয়ার অলঙ্কৃত করবার জন্য।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যই রাখালদাসের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিতা মতিলাল ছিলেন বহরমপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। কিন্তু পৈতৃক পেশার প্রতি রাখালদাসের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। তার পরিবর্তে রাখালদাসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল ভারতের পুরাতত্ত্বের প্রতি এক অনন্যসাধারণ অনুরাগ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও থিওডর ব্লকের নিকট তিনি পুরাতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্রতিভা ছিল তাঁর অসাধারণ। অচিরে তিনি প্রাচীন লিপি ও প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতি লাভ করেন। বস্তুতঃ তাঁর সমকক্ষ প্রাচীন লিপিবিশারদ আজ পর্যন্ত জন্মাননি। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস প্রত্নতত্ত্ববিভাগে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সুপারিন্‌টেনডেণ্ট পদে বৃত হন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ মুখরিত হয়ে ওঠে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অসূর্যম্পশ্যা মহেঞ্জোদারো নগরীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন।

তিন

এইবার আমি মহেঞ্জোদারোর সঙ্গে আমার সংযোগের কথা বলব। মহেঞ্জোদারোর নিদর্শনসমূহ দেখে স্যার জন মার্শালের ধারণা হয়েছিল যে, ওই সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তী কালের হিন্দু-সভ্যতার এক বিশেষ সম্পর্ক থাকতে পারে।

তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এক চিঠি লিখে জানতে চান যে, এ সম্বন্ধে অনুশীলন করবার জন্য একাধারে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং নৃতত্ত্ব এই উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন গবেষক তাঁরা পাঠাতে পারেন কি না। তখনকার দিনে এরূপ ব্যক্তি আমিই একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। সুতরাং আমাকেই যেতে হল মহেঞ্জোদারোয়।

আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম লারকানা ষ্টেশনে, তার পরদিন

সকালে রওনা হলাম মহেঞ্জোদারোর অভিমুখে। মহেঞ্জোদারোতে গিয়ে দর্শন পেলাম মার্কিন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আরনেষ্ট ম্যাকের। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ম্যাকে দম্পতি। অদ্ভুত অমায়িক লোক আরনেষ্ট ম্যাকে; তাঁর চেয়ে বেশি অমায়িক তাঁর স্ত্রী ডরোথি ম্যাকে।

চতুর্দিকে জনহীন প্রান্তর। অদূরে সেই রহস্যময়ী নগরীর কঙ্কাল। তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম। প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা আমাকে বেশ ভয়ার্ত করে তুলল। চতুর্দিকে জমাট অন্ধকার। গভীর নির্জনতা ও নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল, নানারূপ জন্তু-জানোয়ারের সম্ভাষণ। রাত্রে তো ঘুমই হল না। ভোরের দিকে সবেমাত্র একটু তন্দ্রা এসেছে, তন্দ্রা ভেঙে গেল টাইপরাইটারের শব্দে। উঠে দেখি, ডরোথি ম্যাকে টাইপ করতে লেগে গেছেন তাঁর স্বামীর পূর্বদিনের খননকার্যের বিবরণী।

সকালে প্রাতরাশের পর ম্যাকে আমাকে নিয়ে গেলেন সেই রহস্যাবৃত নগরীর ভিতর। তখন সেখানে খননকার্য চলছে। কুলি-মজুররা এসে গেছে এবং তাদের কলরবে জায়গাটা মুখর হয়ে উঠেছে।

দেখলাম নগরটি আয়তনে প্রায় তিন মাইল। ঠিক দাবা-খেলার ছকের অনুকরণে গঠিত। সমান্তরাল কতগুলি রাস্তা বেরিয়ে গেছে প্রশস্ত রাজপথ থেকে। প্রতি দুই সমান্তরাল রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারোখানা বাড়ি। বাড়ির সামনের ঘরগুলি বোধ হয় দোকান-ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত, কেননা, প্রতি বাড়িতেই প্রবেশ করতে হত পাশের সরু গলি দিয়ে। বাড়িগুলি সবই ইটের তৈরি। অধিকাংশই একতলা, তবে দোতলা বাড়িও ছিল।

সেদিন খননকার্যের শেষে ম্যাকে নিয়ে গেলেন বাড়িগুলির ভিতরের প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ দেখাবার জন্য। আরও দেখালেন সেই ১৮০ ফুট লম্বা ও ১০৮ ফুট চওড়া স্নানাগার, এবং ১৫০ ফুট দীর্ঘ, ৭৫ ফুট প্রশস্ত ও ২৫ ফুট উচ্চ শস্যাগার। ম্যাকের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' স্মরণ করে সাড়ে চার হাজার বছর আগের নরনারীর কলরব ও কর্মব্যস্ততার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

নগরীর যে অঞ্চলে তখন খননকার্য চলছিল, তার নামকরণ করা হয়েছিল, DK Area—Intermediate III period। যে প্রশস্ত রাজপথ

ও সমান্তরাল রাস্তার কথা বলেছি, সেগুলো সে বৎসরই আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রশস্ত রাজপথটি উত্তর-দক্ষিণমুখী। রাজপথটি তখন মাত্র এক কিলোমিটার পর্যন্ত খুঁড়ে বের করা হয়েছে। রাজপথটি ৩১ থেকে ৩০ ফুট প্রশস্ত, আর সমান্তরাল পথগুলি ২০ থেকে ২৫ ফুট। সে বৎসর আরও আবিষ্কৃত হয়েছিল নগরীর পয়ঃপ্রণালী। পোড়া ইট দিয়ে তৈরী এই পয়ঃপ্রণালী অনেকটা পথ রাস্তার পশ্চিম ধার দিয়ে এসে এক জায়গায় রাস্তা অতিক্রম করে, রাস্তার পূর্ব পাশ ধরে চলে গিয়েছিল। বাড়ির দূষিত জল এই পয়ঃপ্রণালীতে এসে পড়ত, তবে অনেক বাড়িতে 'সোক পিট'-ও ছিল। প্রতিবাড়ির প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলেই সামনে পড়ত বাড়ির প্রাঙ্গণ। প্রবেশপথের নিকট প্রাঙ্গনের এক পাশে থাকত বাড়ির কূপ। স্নানের সময় আব্রু রক্ষার জন্য কূপ-গুলিকে দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত করা হত। রাজপথের দিকে বাড়ির যে দোকান ঘরগুলি ছিল, তার অনেকগুলির সামনে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম ইটের গাঁথা পাটাতন। বোধ হয় এই পাটাতনগুলির ওপর বিক্রেতারা দিনের বেলা তাদের পণ্যসম্ভার সাজিয়ে রাখত, এবং রাত্রি-কালে সেগুলিকে দোকান-ঘরে তুলে রাখত। ছোট ছোট যে সব দ্রব্য-সামগ্রী আমরা সে বৎসর পেয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিল মেয়েদের মাথার কাঁটা। তা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করেছিলাম যে, মেয়েরা খোঁপা বাঁধত ও খোঁপায় কাঁটা গুঁজত। তবে মেয়েরা যে বেণী ঝুলিয়েও ঘুরে বেড়াত, তার প্রমাণও আমরা পেয়েছিলাম।

চার

ম্যাকের সঙ্গে খননকার্যে লিপ্ত থাকতাম অসীম উৎসাহে। কিন্তু আমার আসল কাজ ছিল সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তী হিন্দু-সভ্যতার যোগসূত্র স্থাপন করা। এই যোগসূত্রগুলির কিছু নিদর্শন ছিল তাঁবুতে, আর অধিকাংশই দিল্লীতে। যেগুলি দিল্লীতে ছিল, সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি আগেই করেছিলাম। এখন মহেঞ্জো-দারোতে সন্তপ্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা করতে লাগলাম।

একদিন বেড়াতে এলেন একজন বাঙালি, ননীগোপাল মজুমদার মশায়। বিকেলের দিকে তিনি আমাকে তাঁবুর বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে

বললেন যে, প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সকলেই স্যার জন মার্শাল বা আর্নেষ্ট ম্যাকে নন্। একজন বাঙালি-বিদ্বেষী অফিসারের নাম করে আমাকে সতর্ক করে দিলেন। বললেন যত শীঘ্র পারো, এখান থেকে পালিয়ে যাও।

কলকাতায় আবার ফিরে এলাম। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্বচক্রের অধ্যক্ষ কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ রমাপ্রসাদ চন্দ-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁরা বললেন যে, ননী-গোপালবাবু ঠিকই পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিকে কথাটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের প্রেসিডেন্ট ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও সেনেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কানে গেল। তাঁরা আমাকে বৈতনিক গবেষক নিযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে যেতে বললেন। দু'বৎসর (১৯২৯-৩১) বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে এই তথ্য উপস্থাপন করলাম যে, হিন্দু সভ্যতার গঠনের মূলে বারো আনা ভাগ আছে সিন্ধু উপত্যকার প্রাক-আর্য সভ্যতা; আর মাত্র চার-আনা ভাগ মণ্ডিত হয়েছে আর্য সভ্যতার আবরণে। আমার গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ আমি স্যার জন মার্শালের নিকট প্রেরণ করতাম। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তো বিশদ প্রতিবেদন পেশ করতেই হত। বন্ধুবর ড. নীহাররঞ্জন রায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি আমার গবেষণা-সম্পর্কিত প্রতিবেদনের অংশ-বিশেষ ওই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিছু অংশ 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি' পত্রিকাতেও (১৯৩৪) প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি (১৯৭৩) ইণ্ডিয়ান পাব্লিকেশনস্ সংস্থা এগুলি পুনর্মুদ্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। ভারতের ইতিহাসের ওপর প্রাক্-বৈদিক সভ্যতার প্রভাব যে কতখানি, তা আমাদের ঐতিহাসিকরা বুঝলেন না। গতানুগতিকভাবে ভারতের ইতিহাস রচিত হতে লাগল, মাত্র বৈদিক যুগের আগে সিন্ধু-সভ্যতা সম্বন্ধে একটা অধ্যায় যোগ করে দিয়ে।

সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন মহেঞ্জোদারোয় গিয়েছিলাম, তখন সিন্ধু-উপত্যকার আর এক স্থানেও অনুরূপ সভ্যতার রহস্য উদ্ঘাটন করা হচ্ছিল। সে জায়গাটা হচ্ছে মহেঞ্জোদারো থেকে প্রায় ৪০০ মাইল উত্তর-পূর্বে পাঞ্জাবের মনটোগোমেরি জেলায় ইরাবতী নদীর পূর্বকূলে অবস্থিত হরপ্পা নামক স্থানে। হরপ্পা জায়গাটা অনেক আগে থেকেই আমাদের জানা ছিল। কিন্তু এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব, মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হবার পূর্বে কেউ বোঝেনি। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ম্যাসন প্রথম হরপ্পার বিশাল ঢিবির কথা আমাদের গোচরে আনেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার বার্নস-ও হরপ্পার ঢিবিটি পরিদর্শন করেন। তারপর ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মেজর-জেনারেল কানিংহাম কয়েকবার জায়গাটা পরিদর্শন করেন। কানিংহাম তখন প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধিকর্তা। হরপ্পা থেকে তিনি যে-সব প্রত্ন-দ্রব্য পেয়েছিলেন তার এক পাতা ছবিও তিনি প্রকাশ করে-ছিলেন। ওই ছবিতে যে-সব জিনিস দেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে পাথরের তৈরি কয়েকটা ছুরির ফলা ও বর্তমানে সুপরিচিত সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যদ্যোতক একটা সীলমোহর ছিল। এই সীলমোহরের গুরুত্ব তখন কেউই উপলব্ধি করতে পারেন নি। ষাট বছরের মধ্যেও কেউ পারলেন না। মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত অনুরূপ সীলমোহরের ছবি যখন এই শতাব্দীর বিশের দশকে বিলাতে 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ'-এ (২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) প্রকাশিত হল, তখনই সারা জগতের পণ্ডিতমহলে ওই নিয়ে আলোড়ন ঘটল। তাঁরা ওই সীলমোহরের সঙ্গে নিকট-প্রাচীতে পাওয়া সীলমোহরসমূহের তুলনা করলেন। তখন এর গুরুত্ব বুঝতে পেরে, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্বময় কর্তা স্যার জন মার্শাল মহেঞ্জোদারোতে খনন-কার্য চালাতে লাগলেন। কয়েক বছর পরে আর্নেস্ট ম্যাকে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে খননকার্য চালানো হয়। তারপর দেশ-বিভাগের পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার মর্টিমার হুইলার আবার এখানে খননকার্য চালান। আরও পরে (১৯৬৫) আমেরিকার

পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর জর্জ ডেল্‌স্‌-ও এখানে খননকার্যে নিযুক্ত থাকেন। এইসব খননকার্যের ফলে মহেঞ্জোদাঁরোয় কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্তর পাওয়া যায়। সব স্তরই সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন যুগের কৃষ্টির নিদর্শন বহন করে। জল প্রকাশ পাওয়াতে একেবারে নিচের স্তরের তলে খননকার্য চালানো গোড়ায় আর সম্ভবপর হয়নি। তা ছাড়া, একেবারে নিচের তলে মাত্র নদীর বালুকা-স্তর লক্ষিত হয়। তা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তার তলার স্তরে আর মানুষের বসতি ছিল না। কিন্তু ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ এফ. ডেলস্ (George F. Dales) তিনটা test borings দ্বারা বর্তমান উপরের স্তর থেকে ৩৫ ফুট গম্ভীরে মানুষের বসতির সন্ধান পান। যে ক'টি স্তর উৎখনিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে বয়সকালের ব্যবধান হচ্ছে মাত্র ৬০০ বছরের। সবচেয়ে তলার স্তরের বয়স হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬৩ অব্দ, আর একেবারে উপরের স্তরের বয়স হচ্ছে ১৬৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এ বয়সগুলো নির্ণীত হয়েছে রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পদ্ধতি অনুযায়ী। আগে এ পদ্ধতি জানা না থাকার দরুন, সমসাময়িক অন্য জায়গায় প্রাপ্ত সভ্যতার সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এর বয়স আরও পুরানো বলে নির্ণয় করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ই. সি. অ্যাণ্ডারসন ও জে. আর. আর্নল্ড-এর সহযোগিতায় উইলার্ড এফ, লিব্‌বি কর্তৃক রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর বয়স বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। এটা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে অনুশীলনের ফলশ্রুতি। যাক্‌, যে কথা আমরা বলছিলাম, আগে আমরা সিন্ধু সভ্যতার বয়স নির্ণয় করতাম সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে এর সাদৃশ্যের ভিত্তিতে। এখন রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পদ্ধতির ভিত্তিতে আমরা সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন পর্বের বয়স স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চয়তার সঙ্গে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছি।

হরপ্পায় খননকার্য চালিয়েছিলেন পণ্ডিত মাধো স্বরূপ ভাট। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই খননকার্য চালানো হয়। তারপর এখানে খননকার্য চালান স্যার মর্টিমার হুইলার ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। (তিনিই হরপ্পার দুর্গ-প্রাকার আবিষ্কার করেন)। মহেঞ্জোদারোর তুলনায় হরপ্পার খনন্‌কার্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এখানে আমরা মহেঞ্জোদারোর চেয়ে অনেক বেশি পুরানো যুগের কৃষ্টির নিদর্শন পেয়েছি। এর মধ্যে ওপরের

ক'টি পর্ব হচ্ছে সিন্ধুসভ্যতার বা তাম্রাশ্মযুগের। আর বাকিগুলি হচ্ছে তার আগেকার যুগের। সবচেয়ে তলার স্তরের বয়স হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ২২৪৫ অব্দ ও একেবারে উপরের স্তরের বয়স হচ্ছে ১৯৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। যেহেতু হরপ্পায় আমরা অনেক প্রাচীন যুগের স্তরে পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছি, সেহেতু সিন্ধু সভ্যতার এখন নামকরণ করা হয়েছে 'হরপ্পা সভ্যতা'। এই নামকবণের পিছনে অন্য যুক্তিও আছে। কেননা, হরপ্পায় আমরা প্রাক্-হরপ্পীয় বসতিরও সন্ধান পেয়েছি। তার মানে, এখানে আমরা অবিচ্ছিন্নভাবে এই সভ্যতার বিবর্তনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাই। এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯২৭-৩১ সময়কালে ননী-গোপাল মজুমদার সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে মহেঞ্জোদারোর সমসাময়িক কালের অনেকগুলি বসতি আবিষ্কার করেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে অরেল স্টাইন বহ্বলপুরের নিকটে সিন্ধু উপত্যকার মধ্যভাগে ঘগ্‌গর-হাকরা নদীর শুষ্ক খাতে হরপ্পা কৃষ্টির অনেকগুলি বসতি আবিষ্কার করেন। তারপর ১৯৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে এ. এচ. দানী গুমলা, রহমান ধেরি ইত্যাদি নয়টি বসতি আবিষ্কার করে উত্তরে হরপ্পা সভ্যতার সীমারেখা গুমলা উপত্যকা পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যান। এদিকে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কে.টি. এম হেগড়ে তাঁর আবিষ্কার দ্বারা হরপ্পা সভ্যতাকে পশ্চিমে গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলার নাগওয়াদা গ্রাম পর্যন্ত টেনে আনেন। ব্যাপকভাবে খননকার্যের ফলে, এখন আমরা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ছাড়া, তাম্রাশ্মযুগের সভ্যতার আরও অনেক কেন্দ্র খুঁজে বের করেছি। এর ফলে আমরা জানতে পেরেছি, যে, এই সভ্যতার বিস্তার পনেরো লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী এক বিস্তৃত এলাকায় ঘটেছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ-বিভাগের পর এই সকল কেন্দ্রের কিছু পাকিস্তানে ও কিছু ভারতের মধ্যে পড়েছে। হরপ্পা সভ্যতার যে-সব কেন্দ্র ভারতের মধ্যে অবস্থিত সেগুলি হচ্ছে—কালিবঙ্গন. লোথাল, রূপার, চণ্ডীগড়, বন ওয়ালি, সুরকোটড়া, দেশলপুর, নবিনাল, রঙপুর, ভগবৎরাও, মাণ্ডা, বরা, বরগাওন, বাহাদারাবাদ, শিশওয়াল, মিটাথাল, আলমগিরপুর, কায়াথা, গিলাণ্ড, টড়িও, দ্বারকা, কিনডারখেদ, প্রভাস, মাটিয়ালা, মোটা, রোজড়ি, নাগওয়াদা, আমরাফলা, জেকডা, সুজনপুর, কানাসুতারিয়া, মেহগাওন, কাপড়খেদা, ও সবলদা। এ ছাড়া, তাম্রাশ্ম-যুগের সভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি—লালকিলা, নোয়া, মানোটি, দৈমাবাদ, ও পশ্চিম

বঙ্গে মহিষদল, বাণেশ্বরডাঙা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি স্থান থেকেও। ১৯২৯-৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈতনিক গবেষক হিসাবে সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে অনুশীলন করেছিলাম, তখন আমার প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদেই আমি বলেছিলাম, "এ সম্পর্কে ঝুঁকি নিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে পরবর্তীকালে অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন গঙ্গা-উপত্যকাতেও পাওয়া যেতে পারে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে এ সভ্যতা উত্তর ও প্রাচ্য ভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল।" ("In this connection one may hazard the opinion that similar disco\e-ries may later on be made in the Ganges Valley to indicate the extension of this civilization in upper and Eastern India.") আজ খননকার্যের ফলে আমার সেই অনুমান বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কেননা, এই সভ্যতার নিদর্শন আমরা বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বীরভূম জেলার মহিষদল প্রভৃতি স্থানেও পেয়েছি।

পাকিস্তানের যে যে স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে আছে—হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, সরাইখোলা, গুমলা, মুণ্ডীগাক, রানাঘুনডাই, ডাবরকোট, ডামরসাদাত, বাহ্বলপুর, কোটদিজি, চান্নু-ধারো, কুল্লি, বালাকোট, আল্লাহদিন ও আমরি। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহম্মদ শরিফ দক্ষিণ-পূর্ব সিন্ধু প্রদেশেও হরপ্পা সভ্যতার বহু বসতি আবিষ্কার করেন।

দুই

এরূপ অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, সিন্ধুসভ্যতা, আর্যসভ্যতার ন্যায় আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। এ সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ভারতেই ঘটেছিল। মূলগতভাবে সিন্ধুসভ্যতা ছিল তাম্রাশ্ম-যুগের সভ্যতা, তার মানে প্রস্তর-যুগের শেষে এই সভ্যতার ধারকদের মধ্যে তামার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সঙ্গে প্রস্তর-যুগ থেকে তাম্রাশ্ম যুগ পর্যন্ত স্তরবিন্যাস আমরা হরপ্পায় পাই। প্রস্তর-যুগের যে স্তর থেকে তাম্রাশ্ম-যুগের উদ্ভব হয়েছিল, তাকে আমরা নবোপলীয় যুগের সভ্যতা বলি। এই নবোপলীয় যুগেই মানুষ প্রথম ভূমিকর্ষণ ও স্থায়ী বসতি স্থাপন শুরু করে। তা ছাড়া, নবোপলীয়

যুগের মানুষরা পশুপালন করত, মৃৎপাত্র তৈরি করত, বস্ত্রবয়ন করতে ও নিজেদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে সকল আয়ুধ বা যন্ত্রাদি ব্যবহার করত, সেগুলোকে বেশ মসৃণ বা পালিশ করত। বস্তুতঃ নবোপলীয় যুগেই প্রথম সভ্যতার সূচনা হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, হরপ্পা সভ্যতা যদি প্রাক্ হরপ্পীয় যুগের নবোপলীয় সভ্যতারই স্বাভাবিক পরিণতি হয়, তা হলে নবোপলীয় সভ্যতার উন্মেষ কোথায় ঘটেছিল? কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহলে এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ছিল। প্যালেষ্টাইনের 'ডেড সী' উপত্যকায় জেরিকো নামক স্থানে একটি প্রাচীন নবোপলীয় গ্রাম আবিষ্কৃত হয়েছিল। রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষায় এর বয়স নির্ণীত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০ অব্দ। এখানে নবোপলীয় ও প্রত্নোপলীয় যুগদ্বয়ের সন্ধিক্ষণের (mesolithic) দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এই সন্ধিযুগের বয়স প্রায় ৮০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম সহস্রকে জেরি-কোতেই নবোপলীয় যুগের সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল। ইরাকের জারমো ও ইরানের টেপি সবাব নামক স্থানদ্বয় থেকেও খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০ থেকে ৬৫০০ অব্দের মধ্যেকার দুটি নবোপলীয় যুগের গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব প্রমাণের ভিত্তি থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, নবো-পলীয় যুগের কৃষ্টি নিকট প্রাচীতেই উদ্ভূত হয়ে জগতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের খনন এবং রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে নিকট-প্রাচীর সমসাময়িক কালেই বা তার কিছু আগে নবোপলীয় গ্রাম থাইল্যাণ্ডেও ছিল। আরও জানতে পারা গিয়েছে যে, নিকট-প্রাচীর নবোপলীয় মানুষদের আগেই জাপানের আদিম অধিবাসীরা মৃৎপাত্র তৈরি করতে জানত। (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'রীডার্স ডাইজেষ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত রোনাল্ড শিলারের "কোথায় সভ্যতার সূচনা হয়েছিল?" নিবন্ধটি দেখুন)। এখন এটা একরকম প্রায় স্বীকৃতই হয়ে গিয়েছে যে নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি জগতের একাধিক স্থানে উদ্ভূত হয়েছিল। ভারতে আমরা প্রত্নোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের বহু কৃষ্টি-কেন্দ্র আবিষ্কার করেছি। সুতরাং ভারতের নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি যে দেশজ প্রত্নোপলীয় যুগের কৃষ্টি থেকেই উদ্ভূত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। (অতুল সুর, 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ১৯৮৮ দ্রঃ)

তিন

প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কৃষ্টিসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করে আমরা আবার ভারতের অন্য জায়গায় প্রাপ্ত নবোপলীয় ও তাম্রাশ্ম-সভ্যতার কথায় ফিরে আসব।

আমরা প্রথমেই আরম্ভ করব সিন্ধু উপত্যকার পশ্চিমে অবস্থিত বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের কথা নিয়ে। সিন্ধুসভ্যতার অনুপ্রবেশ পশ্চিম দিক থেকে হয়েছিল কিনা, সেটা নির্ণয় করবার জন্য বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বিষয় আলোচনা দরকার। বেলুচিস্তানে সবচেয়ে প্রাচীন যে বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তা উত্তর বেলুচিস্তানে অবস্থিত কিলিগুল মহম্মদ নামক স্থানে ৩০০ ফুট লম্বা ও ১৮০ ফুট চওড়া এক ঢিবি। এখানে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফেয়ারসার্ভিস (W. A. Fairservis) কর্তৃক খননের ফলে, আমরা কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্তর পেয়েছি। প্রথম যুগের স্তরে (তার মানে সকলের তলার স্তরে) একটি রান্নার জায়গার কাছে আমরা যে সব দ্রব্যাদি পেয়েছি রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষার দ্বারা তাদের বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৬৮৮ থেকে ৩৭১২ অব্দ। তার আরও দশ হাত নিচের স্তরে আমরা যে সব নিদর্শন পেয়েছি, তা থেকে দেখা যায় যে ওই জায়গার অধিবাসীরা গৃহপালিত পশু হিসাবে মেষ, ছাগল ও গরু পুষত ও কাঁচা মাটির ইট দিয়ে ঘর তৈরি করত। তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মধ্যে যা পাওয়া গিয়েছে, তা হচ্ছে—পাথরের ছুরির ফলা, ঘর্ষণ দ্বারা চূর্ণ বা মসৃণ করবার পাথর ইত্যাদি। কিন্তু ধাতু-নির্মিত কোন দ্রব্যাদি পাওয়া যায়নি। এর উপরের যুগের (তার মানে দ্বিতীয় যুগের) কৃষ্টির মধ্যে আমরা নতুন বিশেষ কিছু লক্ষ্য করি না, তবে তারা খুব নিকৃষ্ট ধরণের হাতে গড়া মৃৎপাত্র তৈরি করত। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রথম যুগের কৃষ্টি ছিল, প্রাক্-মৃৎপাত্র যুগের লোকদের, আর দ্বিতীয় যুগের কৃষ্টি ছিল মৃৎপাত্র তৈরির যুগের লোকদের। আরও উপরের স্তরে এসে আমরা প্রথম তামার ব্যবহার লক্ষ্য করি। তবে তখন লোকেরা যুগপৎ হাতে ও চক্রে সুন্দরভাবে মৃৎপাত্র তৈরি করা শিখে ফেলেছিল। ওই সকল মৃৎপাত্রের উপর লাল ও কালো রঙের জ্যামিতিক নক্সা আঁকা হত। এখানে বলা দরকার যে ব্রিগেডিয়ার রস (Brigadier F. J. Ross) উত্তর বেলুচিস্তানের রাণা ঘুণ্ডাইয়ে (কিলিগুল মহম্মদের পূর্ব দিকে)

খননকার্য (১৯৪৬) চালিয়ে যেসব নিদর্শন পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে আমরা কিলিগুল মহম্মদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের কৃষ্টির সম্পর্ক লক্ষ্য করি। এখানেও হাতে-গড়া মৃৎপাত্র ও মেষ, ছাগল, গাধা ও ভারতীয় বৃষের অস্থি পাওয়া গিয়েছে। মধ্য বেলুচিস্তানের আঞ্জিরা ও সিয়া-ডামব-এ কুমারী ছ কার্ডি (Miss B. De. Cardi) যে খননকার্য (১৯৬৫) চালিয়েছিলেন, তা থেকেও আমরা কিলিগুল মহম্মদ-এর কৃষ্টির অনুরূপ কৃষ্টির পরিচয় পাই। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বেলুচিস্তানের বিভিন্ন স্থানের কৃষ্টির মধ্যে একটা ঐক্য ছিল। শুধু তাই নয়। আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাক-এ জে. এম. কাসাল (J. M. Casal) কর্তৃক যে খননকার্য (১৯৫৫) হয়েছিল, তা থেকেও বেলুচিস্তানের কিলি-গুল মহম্মদ-এর অনুরূপ কৃষ্টিসমূহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এসব থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, দক্ষিণ আফগানিস্তান ও কান্দাহারের সমতলভূমির মাঝখান দিয়ে যে প্রাচীন বাণিজ্য-পথ ছিল, সেই পথ দিয়েই এই কৃষ্টি পশ্চিম থেকে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানে প্রবেশ করেছিল। তবে এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদির রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষার ভিত্তিতে করা হয়নি। অবশ্য মুণ্ডিগাকের তৃতীয় যুগের (তলা থেকে উপরের দিকে) আমরা তামা ও ব্রঞ্জের (মনে হয় থাইল্যাণ্ড থেকে বাঙালী বণিকরা নিয়ে যেত) ব্যবহার ও মাটির তৈরী ভারতীয় ককুদ্‌বিশিষ্ট বলদ ও নিকৃষ্ট ধরনের ছোট ছোট স্ত্রীমূর্তি পাই। তা থেকে এ সভ্যতার ভারতীয় চরিত্রই ইঙ্গিত করে। মুণ্ডিগাকের চতুর্থ স্তরে (আবার স্মরণ করিয়ে দিই—স্তরবিন্যাস নিচের থেকে উপর দিকে করা হচ্ছে) আমরা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করি। দেখি যে এই যুগের লোক সুরক্ষিত প্রাকার-বেষ্টিত নগরে বাস করছে এবং উচ্চ ঢিবির উপর রৌদ্র দগ্ধ ইটের মন্দির নির্মান করেছে। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নগরটি দুবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, এবং দুবারই নগরটিকে পুনর্নির্মিত করা হয়েছিল। এরা মৃৎপাত্রের ওপর লাল প্রলেপ দিয়ে, তার ওপর নানারকম স্বভাবজাত অলঙ্করণ করত। মৃৎপাত্রের ওপর এই সব অলঙ্করণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—পাখী, বন্যহাঁস, বলদ ও অশ্বত্থ পাতা। ক্ষুদ্রকায়া মৃন্ময়ী মূর্তিও বহু পাওয়া গিয়েছে। এ সবের ভিত্তিতে মুণ্ডিগাকের এই চরম যুগকে হরপ্পা-সভ্যতার সমসাময়িক বলে ধরা হয়েছে, তবে এ সম্বন্ধে কোন রেডিয়ো-কার্বন ১৪ পরীক্ষা করা হয়নি।

চার

এবার আমরা প্রাক্-হরপ্পা যুগের কৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতাই পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু এরূপ অনুমানের প্রতিকূলে একটা মস্ত বড় অন্তরায় হচ্ছে—করাচির নিকট প্রাপ্ত নবোপলীয় যুগের কৃষ্টির কিছু নিদর্শন। এই কৃষ্টির বয়স বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের নবোপলীয় যুগের কৃষ্টির চেয়ে অনেক প্রাচীন। সুতরাং বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের নবোপলীয় যুগের সভ্যতার অনুপ্রবেশ যদি পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে ঘটত, তা হলে পরিস্থিতিটা অনেকটা ইংরেজী প্রবচন 'ঘোড়ার আগে গাড়ি'র (the car before the horse) মত দাঁড়াত।

বস্তুতঃ আমরি, কোটদিজি, হরপ্পা ও কালিবঙ্গনে আমরা প্রাক্-হরপ্পা যুগের সভ্যতার যে সব নিদর্শন পেয়েছি, তা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে স্বতন্ত্রভাবে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার উন্মেষ ভারতেই হয়েছিল। এ সম্পর্কে আমরির একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কেননা এখানেই ননীগোপাল মজুমদার ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের সভ্যতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন। আমরির প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতাকে ছুটি যুগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম যুগের আবার চারটি পর্ব ছিল। সবচেয়ে প্রাচীনতম পর্বে ঘরবাড়ির অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। মাত্র কয়েকটি নালা, মৃৎপাত্র ও মাটির তলায় সংরক্ষণের জন্য কিছু জালা পাওয়া গিয়েছিল। মৃৎপাত্রগুলি সবই হাতে গড়া, এবং সবগুলিরই অলঙ্করণ এক রঙের, যদিও ছুই রঙেরও কিছু পাওয়া গিয়েছে। এই স্তর থেকে পাথরের তৈরী ছুরির ফলা, পাথরের গুলি (বোধ হয় গুলতিতে ব্যবহৃত হত) ও কয়েকটা তামা ও ব্রঞ্জের টুকরা পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। অবিচ্ছিন্নভাবে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়েছিল। এই স্তরে কাদামাটি দিয়ে তৈরী ইটের ঘরবাড়ির অস্তিত্ব দেখা যায়। এই যুগের মৃৎপাত্র, ছুরির ফলা ও অন্যান্য যন্ত্রাদি উন্নত পদ্ধতিতে তৈরী হত। তৃতীয় পর্বে এ সভ্যতা অনেক উন্নত রূপ ধারণ করেছিল। ঘরবাড়ি কাদামাটির ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী হত এবং বাড়িগুলো উঁচু পাটাতনের ওপর স্থাপিত হত। এ ছাড়া, এ যুগে চক্রে প্রস্তুত নানা রকমের মৃৎপাত্রও

তৈরী হত ও তার ওপর নানা রঙের (যথা বাদামি ও কালো, গেরুয়া বা গোলাপির উপর কমলা লেবুর রঙের) জ্যামিতিক নকসা আঁকা হত। বৈষয়িক সম্পদের মধ্যে আগেকার যুগের মতই পাথরের ছুরির ফলা, হাড়ের তৈরী 'পয়েণ্ট' ইত্যাদি লক্ষিত হয়। প্রথম যুগের মতই এ পর্বে আমরা ওই কৃষ্টির ধারাবাহিকতা দেখতে পাই, তবে এই যুগেরই মৃৎপাত্রের ওপরে আমরা সুন্দরভাবে আঁকা ভারতীয় বলীবর্দ ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর (বোধ হয় চিতা-বাঘ, কি কুকুর) বিষয়বস্তুও পাই। এ ছাড়া, আমরা, গরু, ছাগল, মেষ ও গাধার কঙ্কালাস্থির অংশবিশেষও এখান থেকে পেয়েছি। শস্যের মধ্যে দুরকমের গম ও যবও পাওয়া গিয়েছে। আরও পাওয়া গিয়েছে—খেজুর, তিল, মটর কলাই ইত্যাদি। কোন রকম ভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়েই আমরির দ্বিতীয় যুগের অভ্যুদয় ঘটেছিল। এই যুগের প্রথম দুটি পর্বে আমরি-রীতিতে গঠিত মৃৎপাত্রের সঙ্গে আমরা হরপ্পা-রীতিতে তৈরী মৃৎপাত্রও পাই। সুতরাং এটাকে আমরা এক যুগের সভ্যতা থেকে আর এক যুগের সভ্যতার সন্ধিযুগ বলতে পারি।

আমরি থেকে প্রায় ১০০ মাইল উত্তর-পূর্বে কোটদিজি অবস্থিত (মহেঞ্জোদারো থেকে সামান্য পূর্বে)। তার মানে কোটদিজিও খয়ের-পুর বিভাগে অবস্থিত। এখানে ১৯৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের ড. এফ. এ. খান কর্তৃক খননকার্য চালিত হয়। এখানেও আমরির মত একটা পাহাড়ের পাদদেশে কঠিন জমির ওপরই ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছিল, এবং বসতিটি সুরক্ষিত করা হয়েছিল ১২ থেকে ১৪ ফুট উঁচু প্রাকার দিয়ে বেষ্টিত করে। এই বেষ্টনীর মধ্যে ১৭ ফুট গভীর তলায় বসতির লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে উপরের দশ ফুট স্তরের মধ্যে কাদামাটি ও পাথর দিয়ে গাঁথা ঘরবাড়ি পাওয়া গিয়েছে। বৈষয়িক বস্তুর মধ্যে এখানে আমরা পাই—হস্তচালিত জাঁতা, খল-নুড়ি, গোলক ও একটি সুন্দর মাটির তৈরি বলীবর্দ। তামার তৈরি কোন বস্তু পাওয়া যায়নি, তবে ব্রঞ্জের তৈরি একগাছা বালার ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। মৃৎপাত্রসমূহ চক্রেই তৈরি করা হত, এবং তার উপর পিঙ্গল রঙের সাদামেটে রেখাগত (প্রথম সরল রেখা, তারপর ঢেউ খেলানো রেখা) বা আরও পরে মাছের আঁশের মত নক্‌সা (যা আমরা হরপ্পাতেও দেখতে পাই) আঁকা হত। তাছাড়া, মৃৎপাত্রের আকারের একটা

বিবর্তন আমরা এখানে লক্ষ্য করি। কোটদিজিতে দু-দুবার ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল, এবং এই অগ্নিকাণ্ডের পর আমরা সেখানে হরপ্পা কৃষ্টিরই প্রাধান্য লক্ষ্য করি। এই অগ্নিকাণ্ড থেকে মনে হয়, এরা হরপ্পা কৃষ্টির ধারকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, এবং তাদের দ্বারাই বিজিত হয়েছিল। রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়েছে যে, কোটডিজিতে প্রথম বসতি শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০৫ অব্দে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ২০৯০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে দ্বিতীয় বার অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল।

কোটদিজির ৩০ মাইল পশ্চিমে মহেঞ্জোদারো অবস্থিত। আগেই বলা হয়েছে যে এখানে প্রাক্-হরপ্পা যুগের কোন নিদর্শন খনন করে বের করা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু পণ্ডিতমহল মত প্রকাশ করেছেন, যে, এখানেও আমরি বা কোটদিজির অনুরূপ প্রাক্ হরপ্পীয় যুগের কৃষ্টির প্রাদুর্ভাব ছিল। চানুধারোতেও সেরূপ কৃষ্টির প্রাদুর্ভাবের কথা তাঁরা বলেছিলেন। আর হরপ্পাতে তো প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের মৃৎপাত্র ও অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। কোটদিজির প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সরাই-খোল, আমরি, হরপ্পা, ভুতবৈনিওয়াল, স্পিনামুণ্ডাই, পেরিয়ালে মুণ্ডাই ও কালিবঙ্গনের প্রাক্-হরপ্পীয় কৃষ্টির একটা জ্ঞাতিত্ব আমরা লক্ষ্য করি।

কিন্তু মহেঞ্জোদারোতে প্রাক্-হরপ্পা কৃষ্টির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগে। আগেই বলেছি যে, রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষার পর হরপ্পা সভ্যতার বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ২২৪৫ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬০ অব্দ পর্যন্ত, আর মহেঞ্জোদারোর বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৫০ অব্দ পর্যন্ত। সুতরাং যদি আমরা অনুমান করি যে, আগন্তুক আর্যগণ কর্তৃক বিপর্যস্ত হয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬০ অব্দ নাগাদ হরপ্পাবাসিগণই ৫০০ মাইল দক্ষিণে সরে গিয়ে মহেঞ্জোদারো নগরীতে গিয়ে বাস করছিল, তা হলে আমাদের অনুমান কি একেবারেই ভুল হবে? ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ এফ্ ডেলস test boring দ্বারা বর্তমান উপরের স্তর থেকে ৩৫ ফুট গভীরে মানুষের বসতির সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তা পৃথক কৃষ্টির মানুষের বসতি।

হরপ্পা থেকে ১২০ মাইল দক্ষিণপূর্বে ও কোটদিজি থেকে ৩০০ মাইল পূর্ব উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কালিবঙ্গন। এখানকার সভ্যতাও প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এখানে

খননকার্য শুরু করা হয়। কোটদিজি এবং হরপ্পার মত এখানেও নগর-দুর্গের তলায় প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এখানে প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের গৃহনির্মাণের পাঁচটি অন্তর্দশা লক্ষ্য করা যায়। এখানকার লোকেরা ঘরবাড়ি সবই কাদামাটির ইট দিয়ে তৈরী করত। ঘরের মেঝেতে ও মেঝের নীচে উনুন তৈরী করত। এ যুগের ইটগুলির আকার একই রকমের, তবে পরবর্তী হরপ্পা যুগীয় ইটের আকার থেকে স্বতন্ত্র। বসতিটা অদগ্ধ ইটের প্রাকার দিয়ে বেষ্টিত ছিল। বৈষয়িক বস্তুর মধ্যে পাথরের তৈরী ছুরির ফলা ও করাতের ন্যায় দাঁত-ওয়ালা ফলা পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া, পাওয়া গিয়েছে হাতের শাঁখা, নরম পাথরের গুটি দিয়ে তৈরী গলার হার ইত্যাদি। তামা ও ব্রঞ্জের অনুপস্থিতিই লক্ষিত হয়, যদিও একটা তামার বালা ও একটা কুঠার পাওয়া গিয়েছে। নানারকম কালো-ও-লাল রঙের (black and red ware) (লাল রঙের মৃৎপাত্রের ওপর কালো রঙের চিত্রণ) মৃৎপাত্রও পাওয়া গিয়েছে। তবে তাদের আকার ও অঙ্কিত বিষয়বস্তু আমরি ও কোটদিজি থেকে স্বতন্ত্র। কিছু অঙ্কন হরপ্পা-যুগীয় অঙ্কনের আগমনও সূচনা করে। রেডিয়ো-কার্বন ১৪ পরীক্ষার ফলে কালিবঙ্গনের প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের বয়স খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৭০ অব্দ থেকে ২১০০ অব্দ নির্ণীত হয়েছে। কালিবঙ্গনে হরপ্পা-যুগীয় সভ্যতার সূচনা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২১০০ অব্দ থেকে ২০০০ অব্দের মধ্যে। তার মানে, কালি-বঙ্গনের হরপ্পা যুগের সূচনা প্রায় কোটদিজির হরপ্পা যুগের সূচনার সমসাময়িক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৫০-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘগ্‌গর ও তার শাখা নদীসমূহের উপত্যকায় কালিবঙ্গনের প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের অনুরূপ মৃৎপাত্রসমূহ পাওয়া গিয়েছিল। তখন এই সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির নামকরণ করা হয়েছিল 'সোথি কৃষ্টি'। সোথি কৃষ্টির বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ২৩০০ থেকে ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত। এই পূর্বগামী কৃষ্টি দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশ থেকে নর্মদা নদীর মোহনা পর্যন্ত ও পূর্বদিকে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৃৎপাত্রের প্রমাণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, রাজস্থানের 'বনস' কৃষ্টি (২০০০-১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) হরপ্পীয় ও উত্তর-হরপ্পীয় সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল।

উপরে যে আলোচনা করা হল, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানেও মানুষের বসতি ছিল। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের প্রারম্ভে এক সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক কৃষ্টির অভ্যুত্থান ঘটে আমরিতে। নানারকম বিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমরি কৃষ্টিই হরপ্পা কৃষ্টিতে প্রস্ফুটিত হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, হরপ্পা কৃষ্টির অভ্যুদয়ের পূর্বে আমরি ও কোটদিজি এই উভয় স্থানেই অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল এবং এই অগ্নিকাণ্ডের পরই আমরিতে হরপ্পা কৃষ্টির পত্তন ঘটে। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে হরপ্পা কৃষ্টি সিন্ধু উপত্যকাতে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করছিল।

পাঁচ

নবোপলীয় ও তাম্রাশ্ম যুগের কৃষ্টির অভ্যুদয় ও বিকাশ যে মাত্র সিন্ধু উপত্যকা ও রাজস্থানের কালিবঙ্গন প্রভৃতি স্থানেই ঘটেছিল, তা নয়। প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শন আমরা ভারতের অন্যত্রও পেয়েছি। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসবার আগে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে নবোপলীয় যুগের অভ্যুদয় পর্যন্ত ভারতে কৃষ্টির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া দরকার। নবোপলীয় যুগের অভ্যুদয় ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম বা অষ্টম সহস্রকে। তার মানে সেটা হচ্ছে আজ থেকে মাত্র আট-দশ হাজার বছর আগে। তার আগে কয়েক লক্ষ বছর ধরে মানুষ প্রত্নোপলীয় যুগের কৃষ্টির ধারক ছিল। তবে গোড়ার দিকের মানুষরা আজ জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান মানুষ যে মানবগোষ্ঠী থেকে (Cro-magnons) উদ্ভূত, তার আবির্ভাব হয়েছিল মাত্র ৪০,০০০ বৎসর পূর্বে। তখন প্রত্নোপলীয় যুগ চলছে।

প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষ প্রধানতঃ শিকার ও ফলমূল আহরণের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করত। তবে যারা নদীর ধারে বা সমুদ্রের উপকূলে বাস করত, তারা বোধ হয় গোড়া থেকেই মাছ খেতে আরম্ভ করেছিল। তবে তারা ঠিক সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করত না। 'পরিবার' বা 'পরিবারপুঞ্জই' তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধনের ভিত্তি ছিল। তাদের মধ্যে কোন স্থায়ী বসতিও ছিল না। তার মানে, ভারতের আদি ও মধ্য প্রত্নোপলীয় যুগের লোকেরা যাযাবরের জীবন যাপন করত। শিকারযোগ্য পশু ও

আহরণীয় ফলমূল এক জায়গায় নিঃশেষিত হয়ে গেলে তারা আবার অপর নতুন জায়গাতে যেত। প্রত্নোপলীয় যুগের বিশাল সময়কালকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—আদি, মধ্য ও অন্তিম। পশু শিকারের জন্য প্রত্নোপলীয় যুগের লোকেরা পাথরের তৈরী আয়ুধ ব্যবহার করত। আদি প্রত্নোপলীয় যুগের সময়কালের মধ্যে আয়ুধ নির্মাণের কারিগরি বিদ্যার বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। এটা লক্ষিত হয় মধ্য ও অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগে। এই দুই যুগের মানুষ নানা রকমের আয়ুধ তৈরী করতে আরম্ভ করে।

ছয়

ভারতে প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ আবিষ্কার করেন ব্রুস ফুট (Bruce Foote), কিংগ (King), ওলডাম (Oldham) ও অন্যান্য অনেকে। সর্বপ্রথম প্রত্নোপলীয় আয়ুধ আবিষ্কৃত হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের নিকটে পল্লবরম নামক জায়গায়। তারপর প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয় ভারতের অন্যান্য জায়গায়, যথা—পাকিস্তানের রাওলপিণ্ডি জেলার সোহান-এ, ও ভারতের মাদ্রাজ, গুজরাট, মহরাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের অনেক জায়গায়, ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলায়, বিপাশা ও বনগঙ্গা নদীর উপত্যকায়, কৃষ্ণা, সবরমতী, মহি, ওরসংগ ও নর্মদা নদীসমূহের উপত্যকায়, উত্তরপ্রদেশের রিহংগ নদীর অববাহিকায় ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে। বিলাসপুর, দৌলতপুর, দেহরা, গুলার ও নালাগড় প্রত্নোপলীয় যুগের সংস্কৃতির বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। গুলারে পাঁচটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে উপরের চারটি স্তরে আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে। এই সম্পর্কে কুরনুল জেলার বিল্লসুগম গুহাপুঞ্জের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসকল গুহা হতে অশ্মীভূত জীবাস্থি ও অস্থিনির্মিত আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নোপলীয় যুগের কেন্দ্রসমূহে যেসকল আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে আছে হাত কুঠার, কাটবার যন্ত্র, নুড়ির তৈরী আয়ুধ, চাঁছবার বা ঘসবার যন্ত্রফলক ইত্যাদি। অধিকাংশ আয়ুধই কোয়ার্টজাইট পাথরের তৈরী। যদিও প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ সম্বন্ধে বেশ কিছু অনুশীলন হয়েছে,

তবুও আমরা ভারতে প্রত্নোপলীয় মানবের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে রচনা করতে সক্ষম হইনি। তবে বুঝতে পারা যায় যে, প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষ নদীর ধারে বা নিকটে বাস করত, এবং পশু-পক্ষী শিকার দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করত। যে সকল পাহাড়ে ঝরণা থাকত, সেসব পাহাড়ের গুহাতে ও পাহাড়ের উপর ছাউনি তৈরী করেও তারা বাস করত।

প্রত্নোপলীয় যুগের মধ্যম অন্তর্দশার আয়ুধসমূহ আমরা বিশেষ করে পেয়েছি মাদ্রাজের তিরুনেলবেলি জেলায়, সবরমতী নদীর উপত্যকায়, মহারাষ্ট্রের খাণ্ডিবলি ও অন্যান্য স্থানে, গুজরাটে গোদাবরী নদীর নিম্ন-অববাহিকায়, নর্মদা ও মহি নদীর উপত্যকায়, মহীশূরের ব্রহ্মগিরিতে ও পশ্চিমবঙ্গের বিরভনপুরে।

নবোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ তৈরী করা হত গভীর রঙের আগ্নেয় শিলাখণ্ড দ্বারা। তা ছাড়া সেগুলোকে ঘর্ষণ দ্বারা মসৃণ করা হত। এইসকল আয়ুধের মধ্যে আছে কুঠার, বাটালি, পাথরের লাঠি, মসৃণকারী পাথর, হাতুড়ির মাথা ইত্যাদি। নবোপলীয় যুগের সবচেয়ে প্রাচীন আয়ুধ ডক্টর. এইচ. ডি টেরা (Dr. H. De Terra) কাশ্মীরের বুরঝহমে আবিষ্কার করেন। বারো ফুট মাটি খনন করে তিনি তিনটি কৃষ্টি পর্যায়ের সন্ধান পান। সবচেয়ে উপরের স্তরের বয়স হচ্ছে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। তার পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে হরপ্পা-উত্তর যুগের। আর সবচেয়ে নীচের স্তর হচ্ছে নবোপলীয়। পরে বুরঝহমে পুনরায় খনন করে জানতে পারা গিয়েছে যে, ওখানকার নবোপলীয় যুগের লোকেরা গর্তের মধ্যে বাস করত এবং গর্তে নামবার জন্য সিঁড়ি তৈরী করত। তারা প্রস্তরনির্মিত কুঠার ও অস্থিনির্মিত আয়ুধসমূহ ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্র ব্যবহার করত। নবোপলীয় যুগের আয়ুধ ও দ্রব্যসম্ভারসমূহ আরও যেসব জায়গায় পাওয়া গিয়েছে, তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে উত্তর প্রদেশের হামিরপুর, এলাহাবাদ ও বান্দা জেলায় ও লখনউ জেলার নাগওয়াতে, মধ্যভারতের পান্নায়, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার গারহি মরিলা ও বুলুতেরাই প্রভৃতি জায়গায়, বিহারের হাজারিবাগ, পাটনা, রাঁচি, সাঁওতাল পরগণা ও সিংভূমে, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, দার্জিলিং ও নদীয়া জেলায়, আসামের গারো ও নাগা

পাহাড়ে ও কাছাড় জেলায় ; অন্ধ্রপ্রদেশের রায়চুর ও ওয়ারাংগাল জেলায়, মহীশূরের বাঙ্গালোর ও চিতলদুর্গ জেলায় ; মাদ্রাজের অনন্তপুর, বেলারি, চিংগলপেট, গুনটুর, উত্তর আর্কট, সালেম ও তাঞ্জোর জেলায়। মনে হয়, মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশই নবোপলীয় যুগের সংস্কৃতির কেন্দ্রমণি ছিল। এখানকরে লোকেরা পরে কিছু কিছু সীমিত তামার ব্যবহার করতে শিখেছিল। উপরের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় ও পরে তাম্রাশ্ম যুগ পর্যন্ত সভ্যতার একটা ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় নবোপলীয় সভ্যতা কিভাবে হরপ্পীয় নগর সভ্যতায় বিবর্তিত হয়েছিল ? পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিশেষ কোন আলোকপাত করতে পারেন নি।

সাত

পূর্ব অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষ হয় পাহাড়ের উপর, আর তা নয়তো পাহাড়ের ছাওনির মধ্যে মাটির ঘর তৈরী করে বাস করত। তা ছাড়া কোন কোন জায়গায় আয়ুধ নির্মাণের কারখানাও পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সে যুগের মানুষ সম্পুর্ণভাবে যাযাবরের জীবন যাপন করত না। তার মানে, এ যুগের মানুষ সমাজবদ্ধ হবার চেষ্টা করছিল। সেটা বুঝতে পারা যায় কয়েক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে তাদের চিত্রাঙ্কন দেখে। এ চিত্রাঙ্কনগুলো তারা খুব সম্ভবত সদৃশ-বিধানী প্রক্রিয়ার ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত। তার মানে, তাদের মধ্যে ধর্মেরও উন্মেষ হচ্ছিল। (৫৫পৃষ্ঠার চিত্র দেখুন)।

এই স্থায়ী বসতি স্থাপনের প্রবণতা নবোপলীয় যুগেই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। তারা পশুপালন ও কৃষির উপযোগী স্থানেই বসতি স্থাপন করত। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নবোপলীয় যুগের যে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছে নীচে তাদের তারিখগুলো দেওয়া হল। সবই খ্রীষ্টপূর্ব তারিখ—

১।	কাশ্মীরের বুরজহোম	২২৫০—১৪০০
২।	অন্ধ্রপ্রদেশের উটনুর	২১৭০—১৯২৫

৩।	কালিবঙ্গনের প্রাক-হরপ্পীয়	২১৪৫—১৬০০
৪।	মহীশূরের টেক্কলকেটা	১৬৭৫—১৪৪৫
৫।	মহীশূরের নরশিপুর তালুক	১৬৯৫—১৩৯৫
৬।	মহীশূরের সঙ্গমকল্ল	১৪৯০—১৪৫০
৭।	মহীশূরের হল্লুর	১৬১০—
৮।	মাদ্রাজের পৈয়ামপল্লী	১৩৯০—

কাশ্মীরের বুরজহোমের নবোপলীয় যুগের লোকেরা গুহাগৃহে বাস করত। গুহার প্রবেশদ্বারের নিকট রন্ধনের জন্য উনুন তৈরী করত। বৈষয়িক বস্তুর মধ্যে ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণের পালিশ করা মৃৎপাত্র, হাড়ের তৈরী সুঁচাল যন্ত্র, সুঁচ ও হারপুন, পাথরের তৈরী কুঠার, পাথরের তৈরী গোল বালা ও মাংস কাটিবার ছুরি ও অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তবে এখানে পাথরের তৈরী ছুরির ফলা ও জাঁতাজাতীয় কোন পেষণযন্ত্র পাওয়া যায়নি। রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এ কৃষ্টি খ্রীষ্টপূর্ব ২২৫০ অব্দ থেকে ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত প্রাদুর্ভূত ছিল। অন্তিম দশায় মাত্র একটি ধনুকের ব্যবহারের জন্য তামার তৈরী বাণমুখ পাওয়া গিয়েছে। এরা মৃত ব্যক্তিকে ডিম্বাকার গর্তের মধ্যে কবর দিত এবং মৃতের সঙ্গে কুকুরও সমাধিস্থ করত।

দক্ষিণ ভারতে অনেক কাল আগেই ব্রুস ফুট (R. Bruce Foote) কর্ণাটক অঞ্চলে কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় বহু নবোপলীয় যুগের কুঠার পেয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে স্যার মর্টিমার হুইলার (Sir Mortimer Wheeler) ব্রহ্মগিরিতে খনন শুরু করবার পর হতে সমনকল্লু, পিকলিহাল, মাসকি, টেক্কলকোটা, হল্লুর, উটনুর ও কুপগলে নবোপলীয় যুগের বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে। উটনুর ও কুপগলে নবোপলীয় যুগের গরুর খাটালও পাওয়া গিয়েছে। এসকল স্থানে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের রেডিও-কার্বণ-১৪ পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে পুরানো যে তারিখ পাওয়া গিয়েছে, তা হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৭০ অব্দ অন্ধ্রপ্রদেশের উটনুরে।

দক্ষিণ-ভারতের নবোপলীয় যুগের কৃষ্টিসমূহকে তিনটি অবিচ্ছিন্ন অন্তর্দশায় বিভক্ত করা হয়। যারা সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেছিল তারা গরু, ভেড়া ও ছাগল পালন করত। তাদের বৈষয়িক

সম্পদের মধ্যে ছিল পাথরের তৈরী মসৃণ কুঠার ও ছুরির ফলা, ধূসর বা বাদামী রঙের হাতে-গড়া মৃৎপাত্র ইত্যাদি। তাদের তৈরী মৃৎপাত্রের সঙ্গে আমরি ও কালিবঙ্গনের প্রাক্-হরপ্পীয় মৃৎপাত্রের কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এদের বসতিগুলো পাহাড়ের উপর বা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী মালভূমিতে এবং গরুর খাটালগুলো নিকটস্থ বনে অবস্থিত ছিল। পাহাড়ের গায়ে তারা চিত্রাঙ্কন করত ও পোড়ামাটির ককুদ্‌বিশিষ্ট বলীবর্দ প্রভৃতি তৈরী করত। তাদের মধ্যে জাঁতার ব্যবহারও ছিল, সুতরাং তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তারা শস্য উৎপাদনও করত। ধাতুর ব্যবহার তাদের মধ্যে মোটেই ছিল না।

দ্বিতীয় অন্তর্দশায় এই কৃষ্টির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এযুগে তারা ছেঁচাবেড়ার মাটির ঘর তৈরী করত। মাটির ঘরগুলি চক্রাকারে নির্মিত হত। এ যুগে প্রস্তরনির্মিত কুঠার-শিল্পেরও বহুমুখী বিকাশ ঘটে। এদের তৈরী মৃৎপাত্রসমূহের সঙ্গে প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের মৃৎপাত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই যুগের শেষদিকে তামা ও ব্রোঞ্জে নির্মিত অনেক বস্তু আবির্ভূত হতে

থাকে। রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষায় এ যুগের বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ থেকে ১৫০০ অব্দ।

তৃতীয় যুগে প্রস্তরনির্মিত কুঠার ও ছুরির ফলা শিল্পের অবিচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তামা ও ব্রোঞ্জনির্মিত বস্তু বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তামার বঁড়শীও পাওয়া গিয়েছে, এবং তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা মৎস্যভোজী ছিল। এ যুগের মৃৎপাত্রগুলি চক্রে নির্মিত হত এবং সেগুলি আগেকার যুগের মৃৎপাত্র থেকে কঠিন করা হত। তবে মহীশূরের হল্লুরের লোকেরা ঘোড়া (?) ব্যবহার করত। এসব বস্তুর রেডিয়ো-কার্বন ১৪ পরীক্ষা বিশেষভাবে করা হয়নি। তবে মহারাষ্ট্রের জোরওয়ের কৃষ্টির ভিত্তিতে এর বয়স নিরূপিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ থেকে ১০৫০ অব্দ পর্যন্ত।

নবোপলীয় যুগের কৃষ্টির প্রাদুর্ভাব পূর্ব-ভারতেও ছিল। তবে এ অঞ্চলের নিদর্শনসমূহ উৎখননের ফলে পাওয়া যায়নি। সবই মাটির ওপর থেকে বা নদীর স্তরের মধ্য থেকে পাওয়া গিয়েছে। অধিকাংশই হচ্ছে নবোপলীয় যুগের রীতি অনুসারে নির্মিত পাথরের মসৃণ কুঠার। আসামের নানা স্থানে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় মিরজাপুর ও বান্দা জেলায়, বিহারের সাঁওতাল পরগণায়, ওড়িশার ময়ুরভঞ্জে ও বাঙলার বন-আসুরিয়া, বিশিগুা, জয়পাণ্ডা উপত্যকা, অরগণ্ডা, কুকরাধুপি, তমলুক, শুশুনিয়া, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থান থেকে এরূপ কুঠার পাওয়া গিয়াছে।

তবে যেসব জায়গায় খননকার্য চালানো হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেক জায়গাতেই নবোপলীয় যুগের পরেই তাম্রাশ্ম যুগের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহারাষ্ট্রের দৈমাবাদ, নেভাসা, সোনগাওন প্রভৃতি ও বাঙলাদেশে পাণ্ডুরাজার ঢিবি, ভরতপুর, মহিষদল প্রভৃতি।

উপরে আমরা যে আলোচনা করলাম, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভারতে নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি স্বাধীনভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল এবং কালের বিবর্তনের সঙ্গে তার পরিণতি ঘটেছিল তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভিব্যক্তিতে। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতা যে দেশজ সভ্যতা, সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা আরও অনুমান করেছি যে তাম্রাশ্ম সভ্যতার পরিযান পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ঘটেছিল।

নীচে নবোপলীয় ও তাম্রাশ্ম সভ্যতার কিছু রেডিয়ো-কার্বন-১৪ তারিখ দেওয়া হলো—

	খ্রীষ্টপূর্ব
আল্লাডিং	২১০০—১৯৩০
আমরি	২৯০০—২৭৭৩
ডাম্ব সাদাত	২৫৫৯—২২০১
গুলমা	২২৪৮—
কালিবঙ্গন	২৩৭১—১০০১
কোটদিজি	২৬০৪—২০৯৫
লোথাল	২০৮২—১৮০৯
মহেঞ্জোদারো	২০৮০—১৭৫৮
মুণ্ডিগাক	৩১৪৫—২৭৫৫
কুলিগুল মহম্মদ	৩৭১২—৩৪৬৮
রোজডি	১৯৭৪—১৭৪৮
সোমনাথ	২৪৪৫—১৬১৫
সুরকোটাডা	২০৫২—১৬৬৫
হরপ্পা	২১১০—১১২৫
পাণ্ডুরাজার ঢিবি	১০১২—
মহিষদল	১২৮৫—৬১৫

আট

নবোপলীয় যুগের নিদর্শনসমূহ থেকে, এখন আমরা মোটামুটি ভারতের যে যে স্থানে কৃষ্টির উদ্ভব হয়েছিল ও তাদের মধ্যে কি যোগাযোগ, ছিল তার সন্ধান পেয়েছি।

তাম্রাশ্ম যুগের যে সকল নূতন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আর্যরা হরপ্পা সভ্যতার ধারকদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করা সত্ত্বেও প্রাক্-আর্যদের সমস্ত নগরসমূহ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া, দাক্ষিণাত্যে তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে আমরা গঙ্গা উপত্যকার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের

বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথসমূহের বিদ্যমানতার প্রমাণ পাই। গুজরাট, মালব, বনস উপত্যকা ইত্যাদি স্থান থেকে আমার হরপ্পা-উত্তর যুগের যেসব নিদর্শন পেয়েছি, তা থেকে লৌহযুগ পর্যন্ত একটা সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করি।

বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে আমরা পাঞ্জাবের অনেক জাতির—যথা আভীর, অন্ধক-বৃষ্ণি, যৌধেয়, মালব, শিবি—স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসবাসের উল্লেখ পাই। হরপ্পা-উত্তর যুগে এসব জায়গায় যে হরপ্পা সংস্কৃতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য টিকে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সোথি সংস্কৃতি প্রাক্-হরপ্পা, এবং হরপ্পা সভ্যতার পূর্বগামী কৃষ্টি হিসাবে দক্ষিণ পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশ এবং নর্মদা নদীর মোহনা পর্যন্ত ও পূর্বদিকে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৃৎপাত্রের প্রমাণ (লাল-কালো মৃৎপাত্রের উপর সাদা অঙ্কন থেকে বুঝতে পারা যায় যে, রাজস্থানের বনস কৃষ্টি (২০০০-১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) হরপ্পীয় ও উত্তর-হরপ্পীয় কৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল।

নয়

সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য লক্ষিত হয় প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে অনুশীলনে রত ছিলাম, তখন এই সাদৃশ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছিলাম। (আমার "প্রি-আরিয়ান এলিমেনটস্ ইন হিন্দু কালচার" ১৯৩১ দ্রষ্টব্য)। সুমেরের কিংবদন্তী অনুযায়ী সুমেরীয়রা সুমেরের দেশজ অধিবাসী ছিল না। তাদের কিংবদন্তী অনুযায়ী তারা প্রাচ্য দেশের কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমুদ্রপথে সুমেরে এসেছিল। ডক্টর হল এক সময় এই মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন যে, সুমেরীয়রা ভারত থেকে গিয়ে সুমেরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়াটারলি' পত্রিকায় 'যোগিনীতন্ত্র' থেকে এ সম্বন্ধে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করেছিলাম। এ সম্পর্কে শ্লোকটার বিশেষ গুরুত্ব আছে। সে শ্লোকটা হচ্ছে—"পূর্বে স্বর্ণনদী যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে / দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচলঃ অষ্টকোণং চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী।"

"দিক্করবাসিনীর পীঠস্থান হচ্ছে সেই অষ্টকোণাকৃতি সৌমার দেশে যার পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে স্বর্ণনদী, পশ্চিম সীমান্ত করতোয়া নদী, দক্ষিণে মন্দা পাহাড় ও উত্তরে বিহগাচল নামক পাহাড়।" যে অঞ্চলটাকে এই শ্লোক ইঙ্গিত করছে সেটা হচ্ছে আসাম। সকলেরই জানা আছে যে, আসামের কামাখ্যা হচ্ছে শক্তি-ধর্মের পীঠস্থান। বস্তুতঃ আসাম ও বঙ্গদেশেই শক্তি-ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। সুমেরে শক্তি-ধর্মের প্রাবল্য, ও তাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী যে তারা পূর্বদিকের কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমুদ্রপথে এসেছিল, তার দ্বারা কি বোঝায়, তা বিচার্য। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি আমার 'প্রি-হিস্ট্রি অ্যাণ্ড বিগিনিংস অভ্ সিভিলাইজেশন' পুস্তকে বলেছিলাম— "মিশর, ক্রীট, সুমের, এশিয়া মাইনর, সিন্ধু উপত্যকা ও অন্যত্র যে তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, সম্ভবত সে সভ্যতার জন্মস্থান পূর্বভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বণিকরাই তার বীজ ও মাতৃকাদেবীর উপাসনা পৃথিবীর দূর দেশে নিয়ে গিয়েছিল। কেননা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন জায়গায় ঘটেছিল যেখানে প্রচুর পরিমানে তামা পাওয়া যেত। ধলভূমে ভারতের অন্যতম বিরাট তাম্রখনির বিদ্যমানতা ও প্রাচীন বাঙলার প্রধান বন্দরের নাম তাম্রলিপ্তি সেই মতবাদকেই সমর্থন করে।"

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাচীনকালে বাঙালীরা ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ছিল। ওই অঞ্চলে বাঙালী বণিকদের উপনিবেশের কথা আমরা পরবর্তীকালে মিশরবাসী এক নাবিক-প্রণীত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও উল্লেখ পাই। ভেলেরিয়াস ফ্লাকাস-ও তাঁর 'আরগনটিকা' পুস্তকে লিখে গেছেন যে, গঙ্গারিডি-দেশের বাঙালী বীরেরা কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (ঋগ্বেদ-রচয়িতা নর্ডিক আর্যদের পঞ্চনদে এসে উপস্থিত হবার সমসাময়িককালে) কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরই প্রতিধ্বনি করে ভার্জিলও তাঁর 'জর্জিকাস' নামক কাব্যে লিখে গেছেন যে, গঙ্গারিডির বাঙালী বীরদের শৌর্যবীর্যের কথা "আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব।"

যেহেতু তাম্রাশ্ম সভ্যতাই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটিয়েছিল, সেহেতু এটা মনে করা যেতে পারে যে, বাঙলাদেশই সভ্যতার ইতিহাসে সংঘটিত এই বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা

গ্রহণ করেছিল। তাম্রাশ্ম যুগের পূর্বে যেসব কৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল, যথা—নবোপলীয়, মধ্যোপলীয়, প্রত্নোপলীয় ইত্যাদি,—এগুলির অস্তিত্বও আমরা পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে, যেমন—বীরভূমের মালুতি, পিতনউ, ও মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখার অববাহিকা, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী নদীর উপত্যকা, ঝাড়গ্রামে ডুলুং নদীর ধারে, বনকাটি প্রভৃতি স্থানে পেয়েছি। কারলো চিপলো (Carlo Cipollo) তাঁর 'দি ইকনমিক হিষ্ট্রি অভ্ ওয়ালর্ড পপুলেশন' গ্রন্থে নানারূপ তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একটা প্রশ্ন তুলেছেন—"বঙ্গোপসাগরের আশপাশের মৌশুমী বায়ুপ্রবাহ অঞ্চলেই কি স্বাধীনভাবে ভূমিকর্ষণ ও পশুপালনের সূচনা হয়েছিল?' এটা খুবই অর্থব্যঞ্জক প্রশ্ন এবং এ প্রশ্ন আমাদের মতবাদকেই সমর্থন করে। অবশ্য এই মতবাদকে সমর্থন করবার মত নিশ্চিত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের হয় তো অভাব আছে, কিন্তু সে অভাব ঐকান্তিক খনন-কার্যের অভাবের দরুন। তবে আজ পর্যন্ত এরূপ নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি বলে, তা থেকে এর সম্ভাব্যতার কথা যে একেবারে চিন্তা করা যায় না, সেটাও ঠিক নয়।

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতমহল মনে করতেন যে, আজ থেকে প্রায় আট-নয় হাজার বছর আগে মধ্য-প্রাচ্যের জারমো, জেরিকো ও কাটাল হুয়ুক নামক স্থানসমূহেই নবোপলীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, এবং তা বিকশিত হয়ে ক্রমশঃ ইরানীয় অধিত্যকা ও মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আরও পরেকার আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে, তার চেয়ে আরও আগে নবোপলীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল থাইল্যাণ্ডে। এ সভ্যতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রোনাল্ড শিলার (রিডারস্ ডাইজেস্ট, অক্টোবর ১৯৭০)। সি. ও. সয়ার তাঁর 'এগ্রিকালচারেল অরিজিনস এ্যাণ্ড ডিসপারসেল' গ্রন্থেও বলেছেন যে, দক্ষিণ পুর্ব এশিয়াই নবোপলীয় বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাচীন লীলাভূমি ছিল বলে মনে হয়।

দুই

প্রাচ্য ভারতে নবোপলীয় যুগের পরই তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গের দুই স্থানে খননকার্য চালানোর ফলে

তাম্রাশ্ম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটি স্থান হচ্ছে বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও অপরটি বীরভূম জেলার মহিষদল। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে খননকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬২-৬৫ তে। এখানে চারটি স্তর পাওয়া গিয়েছে। সর্বনিম্ন স্তরটি মাইক্রোলিথিক বা ক্ষুদ্রাশ্মর যুগের। এ-যুগের নিদর্শনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লাল কাঁকর পেটা বিভিন্ন গৃহতল, দুটি মানবসমাধি, কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্রাশ্মর বা মাইক্রোলিথস, ফ্লেক আয়ুধ ও হাড়ের হাতিয়ার, কুম্ভকারের চক্রে নির্মিত লাল কালো ও বাদামী রঙের মৃৎপাত্র এবং ধান্যের খোসা ও শীষ মেশানো হাতে তৈরী ধুসর বর্ণের মৃৎপাত্রাদি। এযুগে ধানচাষের প্রচলন ছিল। এ যুগের শেষে এক প্লাবন ঘটেছিল। সে সময় স্থানটি সাময়িক ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তারপর এখানে আবার বসতি শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তর সেই যুগের। তখনই তাম্রাশ্ম সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। প্রথম যুগের ন্যায় এ যুগের লোকেরাও ছ্যাঁচা বাঁশের ওপর পুরু করে মাটি লেপে ঘরবাড়ী তৈরী করত। মাকড়া-দানা পেটাই করে ঘরের মেঝে তৈরী করত। কোন কোন ক্ষেত্রে তার ওপর চুনের প্রলেপ দিত। তারা লাল-কালো মৃৎপাত্র তৈরী করত এবং শুকর পুষত। দ্বিতীয় যুগে একাধিকবার অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। এ যুগে যে সমস্ত মানবসমাধি পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকাংশই প্রথম যুগের ন্যায় পূর্ব-পশ্চিমে শায়িত। দ্বিতীয় যুগের (তার মানে তাম্রাশ্ম যুগের) স্তরসমূহ থেকে যে সকল প্রত্নদ্রব্য আবিস্কৃত হয়েছে তার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে—নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত লাল-কালো মৃৎপাত্র (তবে সাদা রঙে অঙ্কিত খয়েরী রঙের ও বাসন্তী রঙে অঙ্কিত কালো রঙের মৃৎপাত্রও পাওয়া গিয়েছে)। লাল-কালো মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবাহ-নালীযুক্ত কোশাকুশি, সমান্তরাল দুইধারবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাশ্মর ছুরিকা, হাড়ের আয়ুধ, তামার অলঙ্কার, পোড়ামাটির তকলি এবং শিমুল তুলা দিয়ে বোনা চিকন ও শুভ্র বস্ত্র। পাণ্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় যুগে লোহার ব্যবহার দেখা যায়। চতুর্থযুগে দৃষ্ট হয় মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের নিদর্শনসমূহ। তবে তৃতীয় ও চতুর্থযুগের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান ছিল, কেননা এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর জায়গাটা

বহুদিন পরিত্যক্ত ছিল। দ্বিতীয় বা তাম্রাশ্ম যুগ সম্বন্ধে আলচিন বলেছেন যে সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে এ যুগের কৃষ্টি জোর-ওয়ে (Jorwe) কৃষ্টির সমতুল ছিল। মাত্র একটা নমুনার রেডিয়ো-কার্বন পরীক্ষার ভিত্তিতে পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় স্তরের বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০১২ + ১২০ বৎসর।

সংলগ্ন বীরভূম জেলার মহিষদলের তাম্রাশ্ম যুগের লোকেরা পাণ্ডুরাজার ঢিবির অধিবাসীদের মতই ছ্যাচা বাঁশের ওপর মাটি লেপা কুটিরে বাস করত। এখানে যে সমস্ত প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ছুরিকা, তামার কুঠার, 'কালো-লাল রঙের মৃৎপাত্র। মৃৎপাত্রগুলি কখনও কখনও সাদা রঙে চিত্রিত হত। পাণ্ডুরাজার ঢিবির মত এখানেও নলবিশিষ্ট মৃৎভাণ্ড পাওয়া গিয়েছে। কিছু পরিমাণ পোড়া চালও পাওয়া গিয়েছে। রেডিয়ো কার্বন পরীক্ষার পর এর বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীস্ট-পূর্ব ১২৮২ থেকে ৬১৫ বৎসর।

পরিশেষে বক্তব্য যে বাঙলাদেশের তাম্রাশ্ম সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যে সকল মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে তার ওপর অঙ্কিত জ্যামিতিক নকশা সমূহের সহিত নর্মদা উপত্যকার নাভ্‌দা টোলি, রাজস্থানের আহাড়, মধ্যপ্রদেশের এরন ও মহারাষ্ট্রের বাহাল প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের ওপর চিত্রিত নকশার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

এগারো

বস্তুত, প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগ পর্যন্ত কৃষ্টির বিবর্তনের ধারাবাহিকতা আমরা পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য করি। প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ আমরা বাঙলার নানাস্থান থেকে পেয়েছি। সেই সকল স্থানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—মেদিনাপুর জেলার অরগণ্ডা, সলদা, অষ্টজুরি, শহারি, ভগবন্ধ, কুকরাধুপি, গিডনি, ঝাড়গ্রাম ও চিকলিগড়; বাঁকুড়ার কাল্লা লালবাজার, মনোহর, বন আহুরিয়া, শহরজোরা, কাঁকরাদাড়া, বাউরিডাঙ্গা, বিশিণ্ডা, শুশুনিয়া ও শিলাবতী নদার প্রধান প্রশাখা জয়-পাণ্ডা নদার অববাহিকা; বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতঘনিহা, বিলগভা, সাগরভাঙ্গা, আরা ও খুরুপির জঙ্গল। এ ছাড়া পাওয়া গিয়েছে বীরভূম ও পুরুলিয়ার কয়েকস্থানে (যথা হুরা) ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দেউলপোতায়। এর মধ্যে শুশুনিয়ার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

কেননা এখানে আমরা মনুষ্যনির্মিত আয়ুধের সঙ্গে পেয়েছি প্লাইষ্টোসীন যুগের জীবের অশ্মীভূত কঙ্কালাস্থি। যেহেতু প্লাইস্টোসীন যুগেই নরাকার জীব থেকে প্রকৃত মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল সেহেতু আমরা অনুমান করতে পারি যে মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকেই বাঙলায় মানুষ বাস করে এসেছে। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের অদূরে কংসাবতী নদীর বামতটে সিজুয়া নামক স্থান থেকে এক মানব চোয়ালের অশ্মাভূত চোয়াল পায়। আজ পর্যন্ত এশিয়ায় প্রাচীন প্রকৃত মানবের অশ্মীভূত যত নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন। (অতুল সুর, 'বাঙলা ও বাঙালা' ১৯৮০)।

প্রত্নোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের মধ্যকালীন যুগের কৃষ্টিকে 'মেসোলিথিক' কালচার বলা হয়। মেসোলিথিক কৃষ্টির প্রচুর নিদর্শন ১৯৫৪-৫৭ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার বীরভনপুর আবিষ্কৃত হয়েছে।

বারো

ধারাবাহিকক্রমে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্নোপলীয় যুগ বিকশিত হয়েছিল নবোপলীয় যুগে। নবোপলীয় যুগের বৈশিষ্টামূলক আয়ুধ ছিল মসৃণ কুঠার, বাটালী, মসৃণকারী পাথর, হাতুড়ির মাথা ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের নবোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহকে দুই আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কালিম্পঙ জেলা ও সিকিম রাজ্য। দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পুরুলিয়া জেলার সুবর্ণরেখা, কংসাবতী ও গন্ধেশ্বরী নদীসমূহের তট, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমের মালভূমি ও ভাগিরথী-বিধৌত অঞ্চলে, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার অন্যত্র। এ অঞ্চলের প্রত্নস্থলসমূহ যথা বর্ধমান জেলায় অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও ভরতপুর এবং মেদিনাপুর জেলার তমলুক অঞ্চলের তাম্রাশ্ম যুগের অব্যবহিত নীচের স্তরে আমরা তামার তৈরি দ্রব্যাদির সঙ্গে পেয়েছি নবোপলীয় যুগের কুঠার, পাথরের তৈরি কণ্ঠমালার গুটি, ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ ও চিত্রাঙ্কিত এক সাদামেটে মৃৎপাত্র। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রত্নোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি হতে তাম্রাশ্মযুগের কৃষ্টি সেই ভূখণ্ডেই উদ্ভূত হয়েছিল যার উত্তর-

সীমানায় ছিল ময়ূরাক্ষী নদী, দক্ষিণ সীমানায় রূপনারায়ণ নদী, পশ্চিম সীমানায় কংসাবতী নদী ও পূর্ব সীমানায় ভাগীরথী।

এক কথায়, নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতাই পরবর্তীকালে তাম্রাশ্ম যুগের নাগরিক সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল। যেহেতু তামার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার বাঙলা দেশেই ছিল, তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এই বিবর্তন বাঙলা দেশেই ঘটেছিল, এবং বাঙলার বণিকরাই অন্যত্র তামা সরবরাহ করে সে-সব জায়গায় তাম্রাশ্ম যুগের নগর সভ্যতা গঠনে সাহায্য করেছিল। এটা মেদিনীপুরের লোকদের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। মেদিনীপুরের লোকরা যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ওই জেলার পান্না গ্রাম থেকে। ওই গ্রামে এক পুষ্করিণী খননকালে ৪৫ ফুট গভীর তল থেকে পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কালাবশেষ।

তের

বাঙলায় যে এক বিশাল তাম্রাশ্ম সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে জানতে পারি। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার আগুইবানিতে ৪০ ফুট গভীর মাটির তলা থেকে আমরা পেয়েছি তামার একখানা সম্পূর্ণ পরশু ও অপর একখানা প্রমাণ সাইজের পরশুর ভাঙা মাথা, ছোট সাইজের আধভাঙা আর একখানা পরশু, এগারোখানা তামার বালা এবং খান-কতক ক্ষুদ্রকায় তামার চাঙারি। পুরাতাত্ত্বিক দেবকুমার চক্রবর্তীর মতে এগুলি হরপ্পার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন মানবগোষ্ঠীর। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের মেদিনীপুরের বিনপুর থানার অন্তর্গত তামাজুরি গ্রামেও তাম্রপ্রস্তর যুগের অনুরূপ নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে ওই জেলারই এগরা থানার চাতলা গ্রামে আরও ওই ধরনের কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার কুলগড়া থানার হুরা গ্রামেও কিছু কিছু ওই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুরূপ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার পাণ্ডিগাঁয়ে পাওয়া গিয়েছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঠিক আগাইবানির ধরনের একটি তামার বালা ও পাঁচ-খানা পরশু। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার পরিযান (migration) পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে ঘটেছিল।

সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ

সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যমূলক পরিচয় হচ্ছে—এটা ছিল নগরভিত্তিক সভ্যতা। এর আরও পরিচয় হচ্ছে—এটা ছিল বাণিজ্যিক ও শিক্ষিত সমাজের সভ্যতা। নগরের চতুপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের জনগণই বৈষয়িক ধনোৎপাদনে নিযুক্ত থাকত এবং গ্রামের লোকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নগরে পাঠাত, নগরের বাণিজ্যে সাহায্য করবার জন্য। নগরের চেহারার সঙ্গে গ্রামের চেহারার প্রভেদ ছিল। তবে নগরই হউক, আর গ্রামই হউক, উভয়স্থলেই পাথরের যন্ত্রপাতির সঙ্গে তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহৃত হত। সেজন্য তাম্রাশ্ম সভ্যতার এমন সব কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে নগর নেই, কেবল গ্রামেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশীল সভ্যতার যে সকল লক্ষণ থাকে, তার সবই আমরা সিন্ধু সভ্যতার নগরসমূহে লক্ষ্য করি। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেগরি পসেল (Gregory Possehl) বলেন যে চীন, সুমেরু ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহেই আমরা জগতের প্রাচীনতম ইস্টক নির্মিত পয়ঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেছি। আগেই বলেছি যে, সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন এক বিস্তৃত অঞ্চলে দেড় শতাধিক স্থানে পাওয়া গিয়েছে এবং এটা ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এই সভ্যতার প্রধান নগরসমূহ হচ্ছে—মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গন ও লোথাল। এইসকল নগরের রাস্তাঘাট বেশ সুপরিকল্পিত ছিল। ঘরবাড়ী দগ্ধ ও অদগ্ধ ইট ও পাথর দ্বারা নির্মিত হত। প্রত্যেক বাড়ীতে কূপ থাকত এবং বাড়ির দূষিত জল রাস্তার বাঁধানো পাকা পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ত। তা ছাড়া নগরের মধ্যে ছিল সুদৃঢ় ও উচ্চ প্রাকারবিশিষ্ট দুর্গ, শস্যাগার, মন্দির ও সমাধিস্থান। এক কথায় সংঘবদ্ধভাবে নাগরিক জীবনযাপনের সব লক্ষণ এই সভ্যতার

কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত ছিল। শৃঙ্খলাযুক্ত শাসন-ব্যবস্থাও ছিল। দৈনন্দিন জীবনে অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহসামগ্রী নির্মাণে তামা ও ব্রোঞ্জের বহুল ব্যবহার ছিল। পরিবহনের জন্য চক্রবিশিষ্ট যান ছিল। ভাষার রূপদানের জন্য লিখন-প্রণালীরও ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তাঁর মানে, সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল ও তার জন্য শিক্ষায়তনও ছিল। খাদ্য দ্রব্য ছিল—যব, গম, ধান্য, তিল, মটর, রাই প্রভৃতি শস্য, মেষ, শূকর, কুক্কুট কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস, সমুদ্রের শামুক, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি। পোষাক-আশাকের মধ্যে ছিল কার্পাস সুতার বস্ত্র ও চাদর প্রভৃতি। অঙ্গসাজের জন্য ছিল—সোনা, রূপা, শঙ্খ ও মূল্যবান পাথরের নানারূপ অলঙ্কার, অস্থি ও গজদন্তের চিরুনি, দর্পণ, ক্ষুর, বঁড়শি, সুঁচ ও মেয়েদের মাথার কাঁটা, খেলার জন্য পাশা ও ঘুঁটি ইত্যাদি। সংলগ্ন পুষ্করিণীর সঙ্গে এদের দেবস্থানও ছিল। তারা ঊর্ধ্বলিঙ্গ পশুপতি শিব ও মাতৃকাদেবীর পূজা করত। এসকল নগরের লোকেরা বাইরের জগতের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য করত, কেননা অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শনসমূহ মেসোপটেমিয়া ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত বেহরিং দ্বীপেও পাওয়া গিয়েছে।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গন প্রভৃতি স্থানে নগর নির্মাণ রীতি ও বিন্যাসের ঐক্য দেখে মনে হয় যে, এদের বাস্তু বা স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কিত কোন সাধারণ শাস্ত্র ছিল, যার নির্দেশ অনুযায়ীই এরা নগর নির্মাণ করত। নগরগুলোর বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। তাছাড়া গণিত, ভাস্কর্য, জ্যোতিষ ও ধাতুবিদ্যাতে তারা পারঙ্গম ছিল।

সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলির আয়তন, গৃহসংখ্যা ও জনসংখ্যা দিয়েই আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব। এ-সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকার যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন, তা নীচে দেওয়া হল—

স্থান	আয়তন বর্গফুট	মোট গৃহসংখ্যা	অনুমিত জনসংখ্যা
মহেঞ্জোদারো	৫,৫০০,০০০	১০৪২৮	৪১,২৫০
আমরি	৮,১০,০০০	২,০১২	৬,০০৫

স্থান	আয়তন বর্গফুট	মোট গৃহসংখ্যা	অনুমিত জনসংখ্যা
কোটদিজি	২৪০,০০০	৩০০	১,৮০০
চানহু-দারো	৭০০,০০০	৮,০৭৫	৪,৯৫০
হরপ্পা (E স্তূপ)	২,৭০০,০০০	৩,৩৭৫	২০,২৪০
হরপ্পা (শস্যাগার অঞ্চল)	৯,৭৯,০০০	১,২২৪	৭,৩৪৪
হরপ্পা (মোট)	৩,১৩৯,৫০০	৩,৯২৪	২০,৫৪৪
হরপ্পা (দুর্গাঞ্চল)	১,৫১২,০০০		

প্রথমেই মহেঞ্জোদারোর কথা বলি। অনেকে মনে করেন, মহেঞ্জোদারো শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার। তবে পাকিস্তান সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪১,২৫০। শহরটির পশ্চিমদিকে উঁচু পাটাতনের উপর একটা বিরাট দুর্গ ছিল ও পূর্বদিকে তার নিচে ছিল মূল শহর। দুর্গটা আশপাশের জমি থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু এক টিবির উপর নির্মিত হয়েছিল। দুর্গটা ১২০০ ফুট লম্বা, ৬০০ ফুট চওড়া ও উচ্চতায় প্রায় ত্রিশ ফুট ছিল। দুর্গের উপর যে সকল বাড়ি ছিল, সেগুলি ভিতর দিক অদগ্ধ ইটের ও বাহিরের দিক দগ্ধ ইটের দ্বারা তৈরী হত। প্রতিরক্ষার কারণে দুর্গটি ৪৩ ফুট উঁচু একটা মাটি ও অদগ্ধ ইটের প্রাকার দিয়ে বেষ্টিত ছিল।

দুর্গ অঞ্চলে যে সকল ঘর-বাড়ি ছিল, মনে হয় সেগুলিতে শাসকরা ও পুরোহিতরা বাস করত। (সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আমরা, রাজারাজড়া বাস করার মত কোন রাজপ্রাসাদ পাইনি। তা থেকে মনে হয়, রাজারাজড়ার পরিবর্তে পুরোহিত বা বণিকসঙ্ঘ দ্বারাই নগরসমূহ শাসিত হত)। এছাড়া, দুর্গ অঞ্চলে ছিল একটা জলাশয় ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর। জলাশয়ে নামবার জন্য দুদিকে সিঁড়ি ছিল ও জলাশয় থেকে জল যাতে না বেরিয়ে যায় তার জন্য জলাশয়ের গায়ের দেওয়ালের ছিদ্রগুলি বিটুমেন ও জিপসাম দিয়ে

বুজানো ছিল। মনে হয় জলাশয়টি ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কেননা ওর পাশে একটি দালান, এক সারি ঘর (বোধ হয় বস্ত্র-পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হত) ও ওপরতলায় যাবার সিঁড়ি ছিল। মনে হয়, ওপরতলাতেই কোন দেবায়তন ছিল। এ ছাড়া, দুর্গ অঞ্চলে ছিল ইটের পাটাতনের ওপর একটি শস্যাগার, আয়তনে ১৫০ ফুট লম্বা, ৭৫ ফুট চওড়া ও ২৫ ফুট উচ্চ। এর নীচে ছিল শস্য ঝাড়াই করবার জন্য একটা চাতাল। দুর্গাঞ্চলে আরও কতকগুলি বড় বড় ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলিকে সভাকক্ষ, মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমিতি-গৃহ বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এখানকার একটি ঘরের মধ্যে পাথরের তৈরী উপবিষ্ট এক পুরুষের মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। দেব-মূর্তি বলেই মনে হয়, কেননা এর নিকটেই পাওয়া গিয়েছে কতকগুলি পাথরের বলয় যেগুলো মনে হয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হত। শাসক সম্প্রদায়ই যে দুর্গ অঞ্চলে বাস করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মহেঞ্জোদারো শহরে কয়েকটি বেশ বড় ও ছোট রাস্তা ছিল। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত তিনটি সমান্তরাল রাস্তা ছিল, তার মধ্যে একটি বেশ চওড়া। আর পূর্ব-পশ্চিমে অনেকগুলো রাস্তা সমান্তরালভাবে বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তাগুলির দ্বারা শহরটাকে সাতটা সমায়ত ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতি ব্লকের মধ্যে অনেকগুলি করে গলি ছিল। গলিগুলি বড় রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং গলির দুপাশে সাধারণ লোকের বসতবাড়ীসমূহ ছিল। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেদের বাড়ীগুলি দগ্ধ ইট দিয়ে মজবুত করে তৈরী করা হত। ইটের মাপ ছিল এগার ইঞ্চি লম্বা, সাড়ে-পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও পৌনে-তিন ইঞ্চি পুরু। বাড়িগুলির প্রবেশপথ গলির দিকে করা হত। প্রবেশদ্বারগুলির প্রস্থ সাড়ে-তিন ফুটের কিছু কম করা হত। বাড়িগুলিতে কোন জানালা থাকত না, তবে বায়ু চলাচলের জন্য ওপরদিকে পাথরের ঝাঁঝরি লাগানো থাকত। বাড়িতে প্রবেশ করলে সামনে পড়ত উঠান। উঠানের একদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা স্নানাগার ও অন্যদিকে বসবাসের ঘর থাকত। প্রত্যেক বাড়িতেই কূপ থাকত। বাড়ির দূষিত জল বাইরে রাস্তায় বড় নর্দমায় গিয়ে পড়ত। বাড়ির ছাদ কড়ি-বরগার উপর স্থাপন করা হত। অনেক বাড়ি দোতলাও হত এবং দোতলায়

যাবার জন্য সিঁড়ি থাকত। দেওয়ালের ভিতরে গাঁথা নলপথ দিয়ে উপরের দূষিত জল নীচের নর্দমায় এসে পড়ত।

মহেঞ্জোদারোর নীচের শহরেও একটা দেব-মন্দির ছিল। তাছাড়া শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে সারিবদ্ধভাবে কতকগুলি ছোট ছোট কুঠরি-ঘর ছিল। মনে হয়, এগুলো শ্রমিক বা গরীব শ্রেণীর লোকেদের বসবাসের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। পানীয় জল সরবরাহের জন্য শহরের নানা স্থানে ইদারা বা কূপ ছিল।

মহেঞ্জোদারোর রূপ আমরা যতটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি, হরপ্পার ততটা পারিনি। তার কারণ আধুনিক কালে রেলপথ তৈরীর সময় এখান থেকে বাদবিচার না করেই ইট-পাটকেল সংগ্রহ করা হয়েছিল। তবে এখানেও আমরা পশ্চিমদিকে মহেঞ্জোদারোর সমান আকারের ঢিবির এক দুর্গ দেখতে পাই। দুর্গটি ১২০০ ফুট লম্বা, ৬০০ ফুট চওড়া ও ৩৫ ফুট উচ্চ প্রতিরক্ষা-প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখানেও প্রাকারের ভিতর দিকটা মাটি ও অদগ্ধ ইট ও বাইরের দিকটা দগ্ধ ইট দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। দুর্গের নীচেই ছিল শহর এবং শহরটি মহেঞ্জোদারোর অনুরূপ নকশায় তৈরী করা হয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর মত এ-শহরটিও প্রতিরক্ষা-প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখানকার ঘর বাড়িগুলো ঠিক মহেঞ্জোদারোর মত ছিল এবং এখানে শ্রমিক বা গরীব লোকদের থাকবার জন্য ছোট ছোট কুঠরি সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত ছিল।

কালিবঙ্গনেও ঠিক অনুরূপ ঢিবির উপর দুর্গ ও তার নীচে মূল শহর ছিল। তবে এখানে দুর্গের প্রতিরক্ষার-প্রাকার অদগ্ধ ইট দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। দুর্গের মত মূল শহরটিও অদগ্ধ ইটের প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। শহরে সমান্তরাল অনেকগুলি রাস্তা ছিল এবং মহেঞ্জোদারোর মত শহরটি বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত ছিল। তবে এখানে বোধ হয় দূষিত জল নিষ্কাশনের জন্য কোনরূপ পয়ঃপ্রণালী ছিল না। দূষিত জল রাস্তায় বসানো বড় বড় জালায় গিয়ে পড়ত।

লোথালেই আমরা সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বেশী নিদর্শন আবিষ্কার করেছি। আমেদাবাদ থেকে ৮২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, এই নগরটিতে, খননকার্য শুরু হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। এখানেই জগতের সবচেয়ে প্রাচীনতম পোতাশ্রয় (৭১০ ফুট লম্বা ও ১৫০ ফুট চওড়া) আবিষ্কৃত হয়েছে। লোথালের নগরবিন্যাস একটু অন্য রকমের ছিল।

তার কারণ, লোথাল ছিল বন্দর শহর। শহরটা ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল এবং শহরটার পূর্বদিকে একটা পোতাশ্রয় ছিল। পোতাশ্রয়ের কাছেই ছিল 'ওয়্যারহাউস' বা গুদাম্-ঘর। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মত এখানেও একটা শস্যাগার ছিল। এছাড়া ছিল স্নানাগার, লোকের বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ী ও দুষিত জল নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃ-প্রণালী। রাস্তা ও গলিও অনেকগুলি ছিল। রাস্তাগুলি বারো ফুট থেকে সাড়ে-উনিশ ফুট ও গলিগুলি সাড়ে-ছয় ফুট থেকে নয় ফুট দশ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া ছিল। প্রধান রাস্তাটির উপর তাম্রকার, স্বর্ণকার প্রভৃতির দোকান ও পুঁতির মালার কারখানাসমূহ অবস্থিত ছিল। পোতাশ্রয়টি ইট দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল এবং এটা লম্বায় ৭১২ ফুট ও চওড়ায় ১৫০ ফুট ছিল।

লোথালের ঢিবিটি ৯৩৪ ফুট লম্বা ও ৭৪৯ ফুট চওড়া ছিল। আকারে লোথাল, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার চেয়ে অনেক ছোট শহর ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর দুটি তিন মাইল লম্বা-চওড়া ছিল। লোথাল কিন্তু আকারে মাত্র সওয়া-এক মাইল ছিল। (লোথালের পাশেই আর একটা বাসাঞ্চল পাওয়া গিয়েছে। এটার নামকরণ করা হয়েছে 'বাজার অঞ্চল')। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্থানীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী লোথাল ভাম্বুবতীমাতা নামে এক সমুদ্রের দেবীর পীঠস্থান, এবং এখনও এখানে নগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক ইষ্টকনির্মিত বেষ্টনীর মধ্যে কতকগুলি শিলাখণ্ড ভাম্বুবতীমাতা হিসাবে পুজিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে লোথালে যত ক্ষুদ্রকায়া মৃন্ময়ী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, আর কোথাও তত পাওয়া যায়নি।

লোথালেও পয়ঃপ্রণালী ছিল এবং বাড়ির দুষিত জল রাস্তার ওই পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ত। এছাড়া দুষিত জল নিষ্কাশনের জন্য শোষণ-জালা ছিল। তা ছাড়া মৃত ব্যক্তির সংকারের জন্য এখানে কবরখানাও ছিল। লোথালেও কোন রাজপ্রাসাদ পাওয়া যায়নি। এখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোনরূপ সামাজিক বৈষম্য ছিল না। এক ছয়-কামরা বিশিষ্ট ধনীর বাড়ীর পাশেই তাম্রকার ও পুঁতিকারের ক্ষুদ্রায়তন আবাস লক্ষ্য করা যায়।

তবে উল্লেখনীয় যে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও কালিবঙ্গনের মত, লোথালে আমরা প্রাক-হরপ্পীয় সভ্যতার কোন নিদর্শন পাইনি।

তিন

তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ওই সভ্যতার ধারকদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে খাদ্য-উৎপাদনের স্বয়ম্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আগেকার যুগের লোকের মত, তাদের শিকার, ফলমূল, ও মৎস্য আহরণের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করতে হত না। অবশ্য, নবোপলীয় যুগের অভ্যুত্থানের পর থেকেই এই অনিশ্চয়তা অনেকটা কেটে গিয়েছিল, কিন্তু তাম্রাশ্ম যুগে এই অনিশ্চয়তা সম্পুর্ণ ভাবে নিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে পরিণত হয়েছিল। এ যুগের নগরগুলি (যেমন হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল প্রভৃতি) গ্রামীণ কৃষিজাত ফসলসমূহ গোলাজাত করত এবং নগরবাসীদিগকে খাদ্য উৎপাদনের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে, তাদের শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত করাতে সক্ষম হত।

আমরা আগেই বলেছি যে, ওই যুগের কৃষিজাত শস্যের মধ্যে গম, যব, তিল, সরিষা, মটর, কলাই ইত্যাদি প্রধান ছিল। ধানের উপস্থিতির প্রমাণ আমরা মাত্র লোথাল ও রঙপুর থেকে পাই। তুলার চাষও হত, কেননা, আমরা মহেঞ্জোদারো থেকে এক টুকরো কার্পাস বস্ত্রও পেয়েছি। গৃহপালিত পশুর মধ্যে আমরা পেয়েছি—ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, শূকর, হাতি, উট, হরিণ, কুক্কুট ইত্যাদি। আমরিতে আমরা গণ্ডারের অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাই। তবে গণ্ডারের প্রতিকৃতি আমরা সিন্ধুসভ্যতার অপর কেন্দ্রের সীলমোহরের ওপরও পাই। একথা এখানে বলা দরকার যে গণ্ডার সিন্ধুনদের নিম্ন-উপত্যকায় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পাওয়া যেত। সীলমোহরের ওপরও যে বলীবর্দের প্রতিকৃতি পাই, তা ককুদ্ বিশিষ্ট ও ককুদ্‌বিহীন এই উভয় প্রকারেরই। সাধারণতঃ ককুদ্‌বিশিষ্ট বলীবর্দকে ভারতীয় ও ককুদ্‌বিহীন বলীবর্দকে মধ্য এশিয়ার জীব বলা হয়। কিন্তু জিউনার (Zeuner) বলেন যে, ককুদ্‌বিহীন বলীবর্দ দক্ষিণ এশিয়ার প্লাইষ্টোসীন যুগের 'জেবু' থেকে উদ্ভূত। সে যাই হোক আমরা যে যুগের আলোচনা করছি সে যুগে ককুদ্‌বিহীন বলীবর্দ মধ্য-এশিয়াতেই পাওয়া যেত।

প্রধান খাদ্যশস্য হিসাবে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি শহরের লোকেরা যব ও গমই ব্যবহার করত। বর্ষার প্লাবনের পর ভূমিতে যে পলি পড়ত, সেই পলিমাটির ওপরই প্লাবনের পর সে যুগের মানুষ রবিশস্য

হিসাবে, গম ও যবের চাষ করত। ফসল ওঠানো হত চৈত্র-বৈশাখ মাসে। এই শস্য উৎপাদনের জন্য কোনরূপ সার, জল বা দক্ষতার প্রয়োজন হত না। সামান্য পরিশ্রমেই এই ফসল উৎপাদন করা যেত। তুলা ও তিল অবশ্য হৈমন্তিক (খরিফ) শস্য হিসাবে উৎপাদিত হত। এর জন্য ভূমি যাতে না প্লাবিত হয়, সে কারণে ভূমিতে বাঁধ দেবার প্রয়োজন হত। ডি. ডি. কোশাম্বী বলেছেন (এবং সম্প্রতি আলচিন তাঁকে এ বিষয়ে সমর্থন করেছেন) যে ভূমিকর্ষণের জন্য সিন্ধুসভ্যতার ধারকরা লাঙ্গল ব্যবহার করত না। কিন্তু ১৯২৯-৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমি এ সম্পর্কে আমার অনুশীলনের সময় বলেছিলাম (পরে দেখুন) যে 'লাঙ্গল' শব্দ অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ (যদিও ঋগ্বেদের একস্থানে লাঙ্গল শব্দের উল্লেখ আছে) এবং আর্যরা এ শব্দটি প্রাগার্য জাতিসমূহের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিল। তবে কোশাম্বীর উক্তি এই কারণে সত্য হতে পারে যে লাঙ্গল সাধারণতঃ লৌহ নির্মিত হয়, এবং সেই কারণে লৌহের ব্যবহারের পূর্বে 'লাঙ্গল' উদ্ভূত হয়নি।

নবোপলীয় যুগে আয়ুধ নির্মানের কারখানার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। সুতরাং বিশেষজ্ঞগণ (যারা বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিল) কর্তৃক কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রথা নবোপলীয় যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। তাম্রাশ্ম যুগে মানুষের দক্ষতা ও কারিগরি বিদ্যা অনেক প্রসারিত ও বহুমুখী হয়েছিল। তবে যারা বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিল. তাদের সকলকেই যে কারখানা স্থাপন করতে হত, তা নয়। যথা গৃহনির্মান বা স্থাপত্যের জন্য কারখানা স্থাপন অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার। এরূপ পেশাদারি লোকেরা কর্মস্থলে গিয়েই কাজ করত। সূত্রধরও অনুরূপ ভাবে কাজ করত। রাজমিস্ত্রী ও সূত্রধরের দক্ষতা যে সিন্ধুসভ্যতার যুগে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তা আমরা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবঙ্গন, লোথাল প্রভৃতি শহরের রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী নির্মান, ঘরবাড়ী তৈরী, দুর্গপ্রাকার ও মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারি। যারা কারখানা স্থাপন করে নিজেদের দক্ষতার সাহায্যে বিভিন্ন বস্তু তৈরী করত, তারা ছিল অন্য শ্রেণীর কারিগর বা মিস্ত্রি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পাথর-মিস্ত্রিদের কথা। তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। এক শ্রেণী ছিল ভাস্কর যারা মুর্তি তৈরী করত। আর এক শ্রেণী ছিল সূক্ষ্ম শিল্পী, যারা সীলমোহর তৈরী করত। আর এক

শ্রেণী পাথরের তৈরী ছুরির ফলক ও অন্যান্য নানাবিধ যন্ত্রাদি তৈরী করত। এর পর উল্লেখ করতে হয় কুম্ভকারদের কথা। তারা হাঁড়ি কলসী থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট মাতৃকাদেবীর মূর্তি ও নানারূপ জন্তুর প্রতীক তৈরী করত। মনে হয়, আর এক শ্রেণী ইট তৈরী করত। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবঙ্গন, লোথাল প্রভৃতি স্থানে ইমারত নির্মানে যে প্রভূত দগ্ধ ও অদগ্ধ ইট পাওয়া গিয়েছে. মনে হয় সেগুলি আর এক শ্রেণীর কারিগররা তৈরী করত। এরপর উল্লেখ করতে হয় কর্মকার শ্রেণীর কথা, যারা তামা দিয়ে কুঠার ফলক, বাটালি, বাণমুখ, করাত ইত্যাদি মৌল যন্ত্রাদি থেকে আরম্ভ করে ছুরি, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রাদি তৈরী করত। তবে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে সীলমোহরের অনুরূপ প্রতিকৃতি সম্বলিত যে তামার 'তাবিজ' সমূহ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি এরাই তৈরী করত, কি অন্য কোন বিশেষজ্ঞ দল তৈরী করত তা বলা মুস্কিল। তবে পাথরের তৈরী সীলমোহরের মত, এগুলিও সেরূপ কোন শ্রেণী তৈরী করত, যারা ছিল সাক্ষর ও লিপিদক্ষ ব্যক্তি। আরও মনে হয় যারা তামা ও ব্রোঞ্জের পাত্রাদি তৈরী করত, তারাও অন্য কোনও শ্রেণীর কর্মকার হবে। অনুরূপভাবে যারা অলঙ্কারাদি তৈরী করত তারাও অন্য কোন শ্রেণীর লোক হবে। তারা সোনা ও রূপা দিয়ে হাতের বালা থেকে আরম্ভ করে গলার হার পর্যন্ত নানা রকম গহনা তৈরী করত। ছোট ছোট অলঙ্কারের ওপর কারুকার্য দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, তারা এই শিল্পে বিশেষ দক্ষ ছিল। হাতে বালা ও গলার হার পরিহিতা চার ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট যে ব্রোঞ্জ মূর্তিটি (যাকে নর্তকী বলে অভিহিত করা হয়েছে) মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া গিয়েছে, সেটিও দক্ষতার যথেষ্ট সৌষ্ঠব বহন করে। মণিকারের কাজেও তাদের যথেষ্ট প্রতিভা ছিল। এ ছাড়া, কাপড়ের প্রমাণ থেকে মহেঞ্জোদারোয় আমরা তন্তুবায় শ্রেণীর উপস্থিতিও অনুমান করতে পারি।

বৈষয়িক যেসব বস্তু আমরা সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে পেয়েছি, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তারা নাগরিক জীবনে বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করত। পরিস্থিতিটা মনে হয় এখনকার মতই ছিল। নাগরিক জীবন থেকে গ্রামীণ জীবন সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তবে মনে হয়, কৃষিজাত পণ্যসমূহ নগরে বিক্রি করে গ্রামের লোকেরা যথেষ্ট উপকৃত হত ও স্বচ্ছলতা লাভ করত। তবে এটা স্বাভাবিক যে

নগরের লোকদের মত তাদের স্বচ্ছলতা ছিল না। নগরের লোকেরা তাদের আঢ্যতা অর্জন করত বাণিজ্য দ্বারা।

হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবঙ্গন, লোথাল প্রভৃতি স্থানের নগর-বিন্যাস ও আবিষ্কৃত বৈষয়িকবস্তু সমূহের এক ছবি দেখে এটা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, ওই সভ্যতার ধারকরা এক অভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা সম্ভবপর হয়েছিল একমাত্র আদান প্রদান ও বাণিজ্যের মাধ্যমে। পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ও বাণিজ্য থেকে আরও বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃত অঞ্চলে ওজন মাপের একটা ঐক্য ছিল। এটা মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত প্রচুর পাথরের বাটখারা থেকে বুঝতে পারা যায়। তবে কিসের মাধ্যমে কেনাবেচা হত, তা আমরা জানি না। খুব সম্ভবত এটা হত পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমে। যদি তাই হয়, তাহলে, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে একটা নির্দিষ্ট বিনিময়-হার ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তা থেকে আরও অনুমান করা যেতে পারে যে কাজ কারবারের লেনদেন লিখে রাখা হত। যে সীলমোহরগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো দিয়ে মনে হয় মাটির উপর ছাপ দিয়ে লেবেল তৈরি করে, লেবেলগুলো বাণিজ্যের পণ্য-পূর্ণ ঝুড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। আগেই বলেছি যে, সীলমোহরগুলিতে একটা জন্তুর প্রতিকৃতি ও তার উপর-ভাগে এক ছত্র লেখা থাকত। মনে হয় লেখাগুলি হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের নাম, আর জন্তুর চেহারাগুলি 'টোটেম' বা 'গোষ্ঠী' বা 'সংঘ' বাচক। দেশের একস্থান থেকে আর একস্থানে পণ্যসমূহ হয় নদীপথে, আর তা নয়তো স্থলপথে গরুর গাড়ি করে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। পরিবহণ ব্যাপারে যে গরুর গাড়ি ও নৌকা উভয়ই ব্যবহৃত হত, তা আমরা মাটির তৈরি গরুর গাড়ি ও মাটির তৈরি ও চিত্রাঙ্কিত নৌকা থেকে বুঝতে পারি।

সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা যে রীতিমত বহির্বাণিজ্য করত, তার প্রমাণ আমরা অনেক সূত্র থেকে পাই। তবে মনে হয় এই বহির্বাণিজ্য মাত্র সমুদ্রপথেই হত না। স্থলপথেও বণিকরা দলবদ্ধ হয়ে শকটে করে বা উষ্ট্রপৃষ্ঠে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যেত। প্রাচীন সুমেরের সঙ্গে, বিশেষ করে সেমেটিক বংশীয় রাজা প্রথম সারগন (২৩৭১-২৩১৬ খ্রীষ্ট

পূর্বাব্দ)-এর সময় থেকে এই বাণিজ্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। সুমের বা মেসপোটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক) ভারতীয় দ্রব্যাদি ও ভারতে সুমেরীয় দ্রব্যাদির উপস্থিতি থেকে, এটা আমরা বুঝতে পারি। সমুদ্রপথে বিদেশে প্রেরণের জন্য মালপত্তর নদীপথে লোথালের পোতাশ্রয়ে নিয়ে আসা হত এবং সেখান থেকে সেগুলো জলযানে ভর্তি করে সমুদ্রপথে বিদেশে পাঠানো হত। সুমেরের লোকদের কাছে ভারত 'মেলুয়া' নামে পরিচিত ছিল।

বাঙালীরাও যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য উপলক্ষে লোথালে উপস্থিত ছিল, সে কথা আমি অন্য অধ্যায়ে বলেছি। লোথালে সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্রকায়া মৃন্ময়ী মূর্তির প্রাপ্তি আমার সে অনুমানকে সমর্থন করে, কেননা বাঙলাই ছিল শক্তিধর্মের লীলাকেন্দ্র। তাছাড়া, লোথালই একমাত্র স্থান যেখানে আমরা মাতৃদেবীর (ভানুবতী) এক মূর্তি পেয়েছি। প্রাগৈতিহাসিক উৎখনন সম্বন্ধে বাঙলার রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যথেষ্ট উৎসাহ আগ্রহ আছে, কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তবে পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মহিষদল রাজার ডাঙ্গা, বাণেশ্বর ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে যে উৎখনন হয়েছে, তা থেকে বাঙলার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা সম্বন্ধে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু কিছু আবিষ্কার হয়েছে যা তাম্রাশ্মযুগের সভ্যতা সম্বন্ধে আলোকপাত করে। একদা বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-বীরভূম-বর্ধমান-পুরুলিয়া অঞ্চল জুড়ে তাম্র-প্রস্তর যুগের যে এক বিশাল সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। (আমার লিখিত 'বাঙলা কি সভ্যতার জন্মভূমি?' আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৯৭৯ দেখুন) ঐকান্তিকভাবে উৎখনন কার্য চালালে বাঙলা দেশেও যে প্রাক্-হরপ্পীয় ও হরপ্পীয় যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে বাঙলা নদীবহুল দেশ। বাঙলার নদীসমূহের চঞ্চলতা যে প্রাচীনকালের নদীর ধারে অবস্থিত অনেক নগরীকে বিলুপ্ত করেছে, সেটা বলা বাহুল্য মাত্র। মাত্র ২৫০ বৎসরের পুরানো মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রভৃতি সৌধসমূহ আজ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বাঙলার সংস্কৃতির প্রাচীনতা ও ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে 'বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস' (জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮২) গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

চার

মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা প্রভৃতির লোকেরা যে মাত্র নাগরিক সভ্যতার ধারক ছিল, তা নয়। তাদের মধ্যে শিক্ষারও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সেটা তাদের সীলমোহর সমূহের ওপর লিপিমালা থেকে বুঝতে পারা যায়। যদিও সে লিপির এখনও সন্তোষজনকভাবে পাঠোদ্ধার হয়নি, তবুও এটা প্রায় সর্ববাদিসম্মতক্রমে স্বীকৃত হয়েছে যে এই লিপি থেকেই পরবর্তী কালের ব্রাহ্মী লিপিমালার উদ্ভব হয়েছিল। একথা আমি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় আমার লিখিত এক নিবন্ধে (Script palaeontolo gy) বলেছিলাম।

আগেই বলা হয়েছে যে নরম পাথরের তৈরি এইসকল সীলমোহর-গুলিতে একটা জন্তুর প্রতিকৃতি ও তার উপর দিকে এক ছত্র লিপি থাকত। মনে হয় লিপিগুলি হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের নাম, আর জন্তুর চেহারাগুলি 'টোটেম' বা 'গোষ্ঠী' বা 'সংঘ বাচক'। সেগুলি দিয়ে মনে হয় মাটির উপর ছাপ দিয়ে 'লেবেল' তৈরি করে, লেবেলগুলি পণ্যপূর্ণ ঝুড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। যেহেতু সিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তা থেকে আরও অনুমান করা যেতে পারে যে কাজকারবারের লেনদেন লিখে রাখা হত। এই লিখন-পদ্ধতি যে মাত্র সীলমোহরের ওপরই দেখা যায় তা নয়। তামার পাতের ওপরও কয়েকটি খোদিত। মনে হয় সেগুলি জ্যোতিষিক যন্ত্র হিসাবে বা তাবিজ রূপে ব্যবহৃত হত। সম্প্রতি রুশ দেশীয় পণ্ডিতেরা সীলমোহরের ওপর উৎকীর্ণ চিহ্নগুলির যে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা করেছেন, তা আমার ওই অনুমানকে সমর্থন করে।

পাঁচ

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারে প্রথম চেষ্টা করেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বরূপ বিষ্ণু। তিনি ১৯টি চিহ্নের ধ্বনিমূল্য নির্ণয় করে, তিনটি সীলমোহরের পাঠোদ্ধার প্রকাশ করেন। তারপর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এল. এ. ওয়াডেল 'ইণ্ডো-সুমেরিয়ান সীলস্ ডিসাইফারড্' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে হরপ্পা সীলের লিখন প্রাচীন সুমেরীয় লিখন-রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণনাথ

বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সীলসমূহের এক নূতন পাঠোদ্ধার প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধে তিনি বলেন যে, প্রাচীন সুমেরীয় ও প্রাক্-বৈদিক আর্যরা অভিন্ন। তারপর স্যার জন মারশালের 'মহেঞ্জোদারো' নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়ে সি. জে. গাড মন্তব্য প্রকাশ করেন যে সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহরসমূহের (১) লিখন ডান দিক থেকে বাম দিকে পঠনীয়, (২) লেখা সিল্যাব্‌ল্‌ঘটিত, (৩) লেখা নামবাচক ও (৪) নামগুলি প্রাচীন ইণ্ডো-আরিয়ান ভাষায় লিখিত। ওই বইয়ের অন্য এক অধ্যায়ে এস. ল্যাংগডন মত প্রকাশ করেন যে সিন্ধুলিপি পরবর্তী কালের ব্রাহ্মী লিপিরই জনক। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সি. জে. গাড তাঁর 'সীলস্ অফ এনসিয়েন্ট ষ্টাইল ফাউণ্ড অ্যাট উর' নামক নিবন্ধে দেখান যে প্রাচীন ইরাকের (সুমেরের) উর নগরে প্রাপ্ত ১০টি সীল সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলসমূহের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আমি নানা পত্রিকার মাধ্যমে ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে গুলাউমের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের প্রতি ভারতীয় সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ওই আবিষ্কার অনুযায়ী মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সীলের ওপর লিখিত ৩০০ চিহ্নের সহিত ইষ্টার দ্বীপে প্রাপ্ত লিপির ১৮০ টির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। (চিত্র দেখুন) ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত

তাঁর 'প্রিহিষ্টরিক সিভিলিজেশন অফ্ দি ইণ্ডাস ভ্যালী' নিবন্ধে মত প্রকাশ করেন যে, যদিও সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহের লিপির সহিত প্রাচীন সুমের বা মিশরের লিপির সাদৃশ্য আছে, তা হলেও এর উদ্ভব স্বতন্ত্রভাবে হয়েছিল, এবং ব্রাহ্মী লিপির সহিত এর সম্পর্ক আপতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময় হান্টার অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দি স্ক্রিপট্ অফ্ মহেঞ্জোদারো অ্যাণ্ড হরপ্পা অ্যাণ্ড ইটস্ কানেকশন উইথ আদার স্ক্রিপটস্' নামে এক থিসিস্ পেশ করে পি-

এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। তিনি তাঁর থিসিস্-এ নিম্নলিখিত মতবাদ প্রকাশ করেন—(ক) সিন্ধু-সভ্যতার ধারকরা অনার্য, (খ) সিন্ধু লিপি হতেই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব, (গ) সিন্ধুলিপি ধ্বনিমূলক, (ঘ) সিন্ধুলিপির উদ্ভব ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পূর্বেই হয়েছিল, এবং (ঙ) মিশরীয় লিপি থেকে কিছু অনুকরণ করাও হতে পারে বা ক্রীটদেশীয় লিপির সঙ্গেও এর কোন রকম সম্পর্ক থাকতে পারে, আর (চ) লিখন-রীতি দক্ষিণ থেকে বাম দিকে ছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ এক মতবাদ প্রকাশ করেন যে সীলগুলি বাণিজ্য সম্পর্কে 'কারেন্সি নোট' হিসাবে ব্যবহৃত হত। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালান এস. সি. রস মত প্রকাশ করেন যে সিন্ধু-সভ্যতার লোকেদের ভাষা ইন্দোনেশিয়ান ছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এন. এম. বিলিমরিয়া সিন্ধু-সভ্যতার ধারকদের ঋগ্‌বেদে বর্ণিত পণিদের সঙ্গে সনাক্ত করেন। এর পর অধ্যাপক হ্রজনী সিন্ধুলিপি হিটাইট লিপি বলে মত প্রকাশ করেন। স্বামী শংকরানন্দ তান্ত্রিক অভিধানের সাহায্যে সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে আরও অনেকে যথা, এস. কে. রায়, ফাদার হেরাস, আর. সি. হাজরা, এস. কে. রাও ও অধ্যাপক বঙ্কবিহারী চক্রবর্তীও সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন।

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের এই দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, আমরা এ বিষয়ে যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছি। বস্তুতঃ সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে। তবে সম্প্রতি অধ্যাপক বঙ্কবিহারী চক্রবর্তী যে চেষ্টা করেছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি ৫০১টি সীলমোহরের পাঠোদ্ধার করেছেন। (মোট সীলমোহরের সংখ্যা প্রায় ২৫০০। তাঁর পূর্বে আর কেউই এতগুলি সীলমোহরের পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হননি। অধ্যাপক বঙ্কবিহারী চক্রবর্তীর দৃঢ় প্রত্যয় যে (ক) সিন্ধুলিপি বৈদিক আর্যদের লিপি, (খ) লিপির অর্থ ব্যক্তিবাচক নাম, (গ) লিপি দক্ষিণ থেকে বাম দিকে পড়তে হবে, এবং (ঘ) সিন্ধুলিপি থেকেই ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ওঁর এসব সিদ্ধান্ত পণ্ডিতমহলের সর্ববাদীসম্মত স্বীকৃতি পায়নি।

তিরিশের দশকের গোড়াতেই আমি বলেছিলাম (ভবন কর্তৃক প্রকাশিত 'হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অফ্ দি ইণ্ডিয়ান পিপল্, প্রথম খণ্ড

৫৪৪ পৃষ্ঠা ও পশেলের 'অ্যানসিয়েন্ট সিটিজ অফ দি ইণ্ডাস' পৃষ্ঠা ৪১৫ দেখুন) যে সিন্ধুলিপি থেকেই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছে। পরিণত অবস্থায় ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহৃত হয় সম্রাট অশোকের অনুশাসনসমূহে। সম্রাট অশোকের সময়কাল হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। সুতরাং সিন্ধুলিপি হতে যদি ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে তার একটা বিবর্তন তো নিশ্চয়ই হয়েছিল। এই বিবর্তন এই প্রদর্শিত চিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে।

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)

টীকা—(১) আশোক অনুশাসনের ব্রাহ্মী লিপি, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। (২) পিপরহা লিপি, খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী। (৩) মেগালিথিক বা সমাধিলিপি খ্রীস্টপূর্ব ৭০০-৫০০। (৪) দৈমাবাদ লিপি ১৩০০-১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। (৫) রঙপুর লিপি ১৬০০-১৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। (৬) চণ্ডীগড় লিপি ১৯০০-১৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। (৭) রাখি শাহপুর লিপি ১৯০০-১৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। (৮) লোথাল 'বি' ১৯০০-১৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। (৯) কোজডি লিপি ১৯০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। (১০) মহেঞ্জোদারো লিপি ১৯০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ। (১১) লোথাল 'এ' ২০০০-১৯০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ।

অনেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে সিন্ধু লিপি মূলগতভাবে

দ্রাবিড় লিপি। রুশ দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই লিপির কমপিউটার যন্ত্র-সাহায্যে বিশ্লেষণ (computerized) হবার পর থেকেই, এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ সম্পর্কে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ড. এ. চন্দ্রশেখর বলেন—(১) সিন্ধুলিপি যদি দ্রাবিড় লিপি হয়, তা হলে দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতিগণ কর্তৃক অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারতে তার কি গতি হল? (২) পণ্ডিচেরীর আরিকমেড়ু উৎখননের ফলে, আমরা ইউরোপের রোম সাম্রাজ্যের সমসাময়িক একটি বন্দর-নগর আবিষ্কার করেছি। এখানে একটি মৃৎপাত্রের উপর লিপি পাওয়া গিয়েছে। লিপিটি ব্রাহ্মী অক্ষরের। তামিলনাড়ুর অন্য জায়গায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপিসমূহও ব্রাহ্মী লিপি। (৩) এ থেকে প্রমাণ হয় যে দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতিসমূহের মধ্যে লিখন-প্রণালী প্রবর্তিত হয় তখন, যখন তারা উত্তর ভারতের সংস্পর্শে এসেছিল। তার পূর্বে তাদের কোন লিখন-প্রণালী ছিল না। কিন্তু এ সকল যুক্তি সহজেই খণ্ডনীয়। কেননা, আর্যদের মধ্যে লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মীলিপি তাদের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়েছিল, এর সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। বরং বেদাদি শাস্ত্রসমূহ অনার্যযোনি-সম্ভূত ব্যাসদেব কর্তৃক সংকলন ও অনার্য দেবতা গণেশ (পরে দ্রষ্টব্য) কর্তৃক মহাভারতের শ্রুতিলিখন—এই ট্র্যাডিশন প্রমাণ করে যে লিখন প্রণালী আর্যরা অনার্যদের কাছ থেকে নিয়েছিল।

ছয়

সিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলির ওপর খোদিত লিপির পাঠোদ্ধারের কাজ এখনও চলছে। সিন্ধুলিপিতে আনুমানিক ৩০০ চিহ্ন আছে। তার মধ্যে ২৫০টি মৌল চিহ্ন। বাকীগুলি আনুষঙ্গিক চিহ্ন মাত্র এবং সেগুলি মৌলচিহ্নের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এগুলি হয় স্বরবর্ণ, আর তা নয়তো বর্ণনাকার চিহ্ন বা যতি চিহ্ন। তবে এসব, অনুমান মাত্র। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানা মূল্যবান সহায়ক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বইখানা হচ্ছে ইরাবথম মহাদেবন (Iravatham Mahadevan) সংকলিত সিন্ধুলিপির সূচী (Concordance)। অবশ্য, এর আগে ফিনল্যাণ্ডের ড. আসকো পারপোলা-ও (Dr Asko Parpola) একখানা সূচীগ্রন্থ প্রকাশ

করেছিলেন। কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে মহাদেবন-এর 'সূচী'টাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ছাড়া, সোভিয়েট রাশিয়ার লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. নিকিটা গুরোব (Nikita Gurov) কমপ্যুটার যন্ত্রের সাহায্যে সিন্ধুলিপির সমস্ত চিহ্নগুলির বীপ্সামূলক সংঘটন (frequency distribution) বিশ্লেষণ করেছেন।

সাম্প্রতিককালে এই সকল অনুশীলনের ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার পণ্ডিতমহল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যে সকল সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির ওপর যে লিপি খোদিত আছে, তা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত। আগেই বলেছি, বস্তুতঃ, 'ভাষা'র প্রশ্নই গোড়া থেকে পণ্ডিতমহলকে বিব্রত করে তুলেছে। এ সম্বন্ধে দুটি মত গড়ে উঠেছে। একটি হচ্ছে লিপিগুলি আর্য ভাষায় রচিত। সাম্প্রতিককালে এ মতের পোষক হচ্ছেন এস. আর. রাও (S. R. Rao) ও বঙ্কবিহারী চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিতগণ। আর অন্য মত হচ্ছে, এগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত। এ মতের পোষক হচ্ছেন তামিলনাড়ুর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ড. আর. নাগস্বামী, লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিকিটা গুরোব, অধ্যাপক ড. জ্নরোজোব (Knorozov), ও ফিনল্যাণ্ডের পণ্ডিত ড. আস্কো পারপোলা। রুশ পণ্ডিতগণ তাঁদের অনুশীলনের ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হচ্ছে (১) লিপিগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত, (২) লিপিগুলি ধর্মমূলক (hierographic), (৩) কিছু লিপি জ্যোতিষিক, (৪) লিপিগুলিতে গুণবাচক শব্দগুলি বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে, (৫) পরিবর্তনশীল (variable) চিহ্নগুলি যুগ্মমূল্যবিশিষ্ট যথা, ক, খ, গ, যদি পরিবর্তনশীল চিহ্ন হয় এবং এর পর যদি মীন (মৎস্য) চিহ্ন থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে এর মানে হচ্ছে পরিবর্তনশীল চিহ্ন + মীন। এর দু-একটা উদাহরণ দিয়ে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোন ক্ষেত্রে এরূপ যুগ্ম চিহ্নের অর্থ হচ্ছে কৃত্তিকা নক্ষত্র, আবার কোন ক্ষেত্রে মৃগশীর্ষ নক্ষত্র। (৬) লিপিগুলিতে বহুবচনের পরিবর্তে বিশেষ্যের সঙ্গে সংখ্যাবাচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। সীলমোহরগুলির ওপর যে সকল প্রাণী বা অন্য কোনরূপ প্রতীক চিত্র আছে, তার অর্থও তাঁরা ভারতীয় পুরাণসমূহে বিধৃত কাহিনীর সাহায্যে লাভ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মনে

করেন যে যম, শিব, স্কন্দ প্রভৃতি হিন্দু দেবতাগণ প্রাক্-বৈদিক দেবতা। তাঁরা আরও বলতে চেয়েছেন যে ঔপনিষদিক যুগেই বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক সংস্কৃতির একটা সংশ্লেষণ ঘটেছিল, এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে 'হিন্দু সংস্কৃতি'। বলা বাহুল্য যে ১৯২৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন করে, স্বাধীনভাবে আমিও ওই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। ('ক্যালকাটা রিভিউ' ১৯৩১ দেখুন)

সিন্ধু-সভ্যতার ভাষাটা যে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য রুশদেশীয় পণ্ডিতগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সেটা সংক্ষেপে এখানে বলা প্রয়োজন। কমপ্যুটার যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা প্রথমে চিহ্নগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তারপর তাঁরা ওর বৈশিষ্ট্য-গুলির সঙ্গে সংস্কৃত, সুমেরীয়, ব্রাহুই, দ্রাবিড়, মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য তুলনা করেছেন। এর ফলেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন যে ওই ভাষার গঠন ব্যাপারে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহেরই সবচেয়ে বেশি মিল আছে।

সাত

বস্তুতঃ অনেকেই বলেন যে সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা অভিন্ন। কিন্তু এটা যে ভ্রান্ত মত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা দুই সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে। এই দুই সভ্যতার মধ্যে মূলগত পার্থক্যগুলি আমি নিচে বিবৃত করছি।

১। সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা শিশ্ন-উপাসক ছিল, ও মাতৃকাদেবীর আরাধনা করত। আর্যরা শিশ্ন-উপাসক ছিল না। তারা শিশ্ন-উপাসকদের ঘৃণা ও নিন্দা করত। লিঙ্গ উপাসনা ভারতে নবোপলীয় যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতৃকাদেবীর পূজার কোন আভাসই আমরা ঋগবেদে পাই না। আর্যরা পুরুষ দেবতাগণের উদ্দেশ্যেই স্তোত্র রচনা ও যজ্ঞ করত। তাদের যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত কোন দ্রব্য বা উপকরণ সিন্ধু সভ্যতার কোন কেন্দ্রে পাওয়া যায় নি।

২। আর্যদের কাছে ঘোড়াই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জন্তু ছিল। সিন্ধু

সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে ঘোড়ার কোন কঙ্কালই পাওয়া যায় নি। সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের কাছে বলীবর্দই প্রধান জন্তু ছিল, এটা সীল-মোহরসমূহের ওপর পুনঃ পুনঃ বলীবর্দের প্রতিকৃতি খোদন থেকে বুঝতে পারা যায়। পশুপতি শিব-আরাধনার প্রমাণ মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া গিয়েছে। বলীবর্দ শিবেরই বাহন। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে বলীবর্দের প্রাধান্য সহজেই অনুমেয়। 'শিব' শব্দটা যে দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, তার প্রতি আমি বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। দ্রাবিড় ভাষায় 'শিব' শব্দের অর্থ 'রুদ্রবর্ণ'। মনে হয়, পরবর্তী কালে বৈদিক সমাজে রুদ্রের আরাধনা অনার্য শিব থেকেই এসেছিল।

৩। সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা নগরবাসী ছিল। আর্যরা নগর নির্মাণ করত না। তারা নগর ধ্বংস করত। সেজন্য তারা তাদের দেবতা ইন্দ্রের নাম 'পুরন্দর' রেখেছিল। 'নগর' বা 'পুর' শব্দটা দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। দ্রাবিড়রাই নগর নির্মাণ করত। এ থেকে সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে দ্রাবিড়দের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়।

৪। আর্যরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা মৃতকে সমাধিস্থ করত। এটা সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে সমাধিস্থানের অস্তিত্ব থেকে বুঝতে পারা যায়।

৫। আর্যদের মধ্যে লিখন প্রণালীর প্রচলন ছিল না। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের মধ্যে লিখন প্রণালী সুপ্রচলিত ছিল। আর্যরা সাহিত্য কণ্ঠস্থ করত।

৬। সিন্ধু সভ্যতা যে আর্য সভ্যতা নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে মৃৎপাত্র। কুরু-পাঞ্চাল দেশ, তার মানে যেখানে আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল, সেখানকার বৈশিষ্ট্যমূলক মৃৎপাত্রের রঙ ছিল ধূসর বর্ণ। সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে যেসব মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলির রঙ হচ্ছে 'কালো-লাল'।

৭। সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। আর্যরা প্রথমে কৃষিকর্ম জানতেন না। এটা শতপথ ব্রাহ্মণের (২।৩।৭·৮) এক উক্তি থেকে প্রকাশ পায়। সেখানে বলা হয়েছে—"প্রথমতঃ দেবতারা একটি মানুষকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করলেন। তার উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহে প্রবেশ করল। তারপর দেবতারা অশ্বকে উৎসর্গ করলেন। উৎসর্গীকৃত আত্মা

অশ্বদেহ হতে পুনরায় বলীবর্দে প্রবেশ করল। বলীবর্দকে উৎসর্গ করা হলে, ওই আত্মা মেষদেহে প্রবিষ্ট হল। মেষ উৎসর্গীকৃত হলে, উহা ছাগদেহে প্রবিষ্ট হল। ছাগ উৎসর্গীকৃত হলে, পৃথিবীতে প্রবেশ করল। দেবতারা পৃথিবী খনন করে গম ও যব আকারে ওই আত্মাকে পেলেন। তদবধি সকলে শস্যাদি কর্ষণ দ্বারা পেয়ে থাকে।" শতপথ ব্রাহ্মণের এই বিবরণটা অত্যন্ত অর্থদ্যোতক। এর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় লুক্কায়িত আছে, আর্যদের কৃষ্টির ইতিহাস। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে আর্যরা প্রথমে ভূমিকর্ষণ দ্বারা শস্যাদি উৎপাদন করতে জানতেন না। তাঁরা ছিলেন যাযাবর জাতি, এবং সম্ভবত তাঁদের আদিম বাসস্থান ছিল কোন শীতপ্রধান দেশে। সেখানে শরীরকে গরম রাখার জন্য তাঁরা মাংসাশী ছিলেন। সেখানে উৎসর্গীকৃত প্রাণীসমূহের মাংস তাঁরা ভক্ষণ করতেন। ভারতে আসবার পর অশ্বমেধই তাঁদের প্রধান যজ্ঞ ছিল। অশ্বমেধের ঘোড়ার রান্না-মাংস খাবার জন্য ঋষিদের রসনায় জল গড়াত। (ঋগ্‌বেদ ১।১৬২।২১)। শুধু অশ্ব নয়, মহিষ, বৃষ, গাভী ও গোবৎসও তাঁদের প্রিয় খাদ্য ছিল। (ঋগ্‌বেদ ৬।১৭।১১; ১০।৮৬।১৩; ১০।৮৬।১৪)। অতিথি এলে তাঁরা গরুর মাংস রান্না করে খাওয়াতেন। এর জন্য অতিথির এক নাম ছিল 'গোঘ্ন'। সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা গো-মাংস খেত না। তা ছাড়া সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা মৎস্যভোজী ছিল। আর্যরা মৎস্যভক্ষণ করত না।

৮। সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা হাতির সঙ্গে বেশ সুপরিচিত ছিল। আর্যদের কাছে হাতি এক নূতন জীব-বিশেষ ছিল। সেজন্য তারা হাতিকে 'হস্তবিশিষ্ট মৃগ' বলে বর্ণনা করত।

৯। হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা কুক্কুট, মৎস্য, কচ্ছপ ও বরাহের মাংস ভক্ষণ করত। কিন্তু আর্যরা তা করত না। বর্তমানকালে ভারতের আদিম অধিবাসীদের পূজা-আস্রাদিতে কুক্কুট উৎসর্গ করা একটা অবশ্য করণীয় অঙ্গ।

১০। সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা যে আর্য নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আর্যভাষাভাষী নর্ডিক নর-গোষ্ঠীর কঙ্কালের অভাব। যে সকল নরগোষ্ঠীর কঙ্কাল সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে পাওয়া গিয়েছে, তারা হচ্ছে, (১) মেডিটেরেনিয়ান, (২) প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, (৩) মংগোলয়েড ও (৪) আলপিয়ান।

এসব কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে—লোথাল, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গন ও রূপারে।

সুতরাং সিন্ধু সভ্যতা যে আর্য সভ্যতা নয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা এক উন্নত বৈষয়িক সভ্যতার ধারক ছিল। অপরপক্ষে আর্যরা ছিল এক বর্বর জাতি। বস্তুত আর্যরা যে এক বর্বর জাতি ছিল, গত সত্তর বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও বৈদিক অনুশীলনের ফলে তা জানা গিয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য প্রকাশ করেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভি. গর্ডন. চাইল্ড্ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'দি আরিয়েনস্' গ্রন্থে। তিনি বলেছিলেন যে আর্যদের বর্বরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, তাদের কার্যকলাপে। জগতের যেখানেই গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানেই তারা সেখানকার উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। চাইল্ড্-এর এই মন্তব্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাগার্য সভ্যতাসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, পণ্ডিত-সমাজ এটা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখন আর্যদের সম্বন্ধে যখনই কিছু লেখা হয়, তখনই তাদের বর্বর জাতি বলে অভিহিত করা হয়। সর্বত্রই তারা উন্নতমানের প্রাগার্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে নিজেদের হীন ও বর্বর সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান শতাব্দীর ছুইয়ের দশকের শেষ দিকে বর্তমান লেখকই প্রথম প্রমাণ করেন যে, মাত্র এক জায়গাতেই আর্যদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে এসে তাঁরা যে উন্নতমানের সভ্যতার সম্মুখীন হয়েছিল, এবং যাদের বাহকদের বিরুদ্ধে তাঁরা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেই তাঁদের মাথা অবনত করতে হয়েছিল। কেননা, সিন্ধু সভ্যতার মধ্যেই আমরা নিহিত দেখি পরবর্তী কালের উন্নত হিন্দু সভ্যতার মূল উপাদানসমূহ।

ভারতে আর্যরা ছিল আগন্তুক জাতি। তারা কবে এবং কোথা থেকে ভারতে এসেছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এই তথ্য বের করবার একটা সূত্র আছে। এটা সর্ববাদিসম্মত যে আর্যরাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল এবং ঘোড়ায়-টানা হালকা ধরনের জঙ্গিরথ তৈরি করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে প্লাইষ্টোসীন যুগের শেষভাগে ঘোড়া বন্য অবস্থায় রুশ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ও ইউক্রেনিয়ার শুষ্ক ও তৃণাবৃত প্রান্তরে বিচরণ করত। সেখান থেকে ঘোড়া পূর্বদিকে কাজাখিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। সুতরাং আর্যরা যখন ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল, তখন এই অঞ্চলেই কোন স্থানে তাদের আদিম নিবাস ছিল।

মনে হয় আর্যগণ কর্তৃক ঘোড়াকে বশীভূত করার ঘটনাটা ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ঘটেছিল। কেননা, এরূপ ঘোড়ায়-টানা রথের কথা আমরা ১৮০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে উত্তর সীরিয়ার খবুর অঞ্চলে সামসি আদাদের চাগর বাজার ফলকে উল্লেখিত দেখি। আর্যজাতির এই সময়ের আরও অনেক লিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে আর্যরা ইরানীয় অঞ্চলে নিজেদের বিস্তার করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যাবিলনের কাশাইট বংশীয় শাসকরা ইন্দো-ইওরোপীয় (আর্য) নাম ধারণ করত। পরবর্তী শতাব্দীর মিতানির শাসকরাও তাই। আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিটটী রাজা সুবিলুলিউমার সঙ্গে মিতানির রাজা মতিওয়াজার এক সন্ধি হয়েছিল। ওই সন্ধিপত্রে ঋগ্‌বেদে উল্লেখিত মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে বোগাজকুই থেকে যে সমস্ত লিপি-ফলক পাওয়া গিয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে মিতানিবাসী জনৈক কিককুলী কর্তৃক রচিত 'অশ্ববিদ্যা' সম্বন্ধে একখানা নিবন্ধ।

দুই

আগেই আর্যদের বিষয়ে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে 'আর্য' শব্দটি মোটেই জাতিবাচক (racial) শব্দ

নয়। এটা ভাষাবাচক শব্দ। যে সকল জাতি বা নরগোষ্ঠী এই ভাষায় কথা বলত, তাদেরই আমরা আর্য বলি। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে দুই বিশিষ্ট নরগোষ্ঠী আর্য ভাষায় কথা বলত। তাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী ছিল 'নর্ডিক' ও অপর গোষ্ঠী 'আলপীয়'। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক প্রভেদ ছিল মাথার খুলির আকার। নর্ডিকরা ছিল দীর্ঘকপাল জাতি, আর আলপীয়রা হ্রস্বকপাল জাতি। নর্ডিকদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়, মাথা বেশি লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। এরা উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করেছিল এবং ক্রমশ পূর্বদিকে নিজেদের বিস্তার করেছিল বিদেহ ও মিথিলা পর্যন্ত। আলপীয়দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মধ্যমাকার, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল ও গায়ের রঙ ফরসা ও দৈহিক ওজন নর্ডিকদের চেয়ে কম।

ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডই আর্যজাতির আদি বাসস্থান ছিল। এখানে নর্ডিক ও আলপীয় এই উভয় গোষ্ঠীর লোকই বাস করত। নবোপলীয় যুগের উত্তরকালে আলপীয়রা কৃষি-পরায়ণ হয়, আর নর্ডিকরা পশুপালনে রত থাকে। এর ফলে উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। নর্ডিকরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকারের উপাসক ছিল, এবং উপাস্যদের 'দেব' বলে অভিহিত করত। আর আলপীয়রা কৃষির সাফল্যের জন্য সৃজনশক্তিরূপ দেবতাসমূহের পূজা করত। তাদের তারা 'অসুর' নামে অভিহিত করত। মনে হয় আলপীয়রাই প্রথম নিজেদের এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত করে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদ্বয় বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। তারপর তারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাদেরই একদল এশিয়া মাইনর বা বেলুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে, ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং আর-একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে।

আরও মনে হয় তারা দ্রাবিড়দের অনুসরণে এসেছিল। আর অপরপক্ষে নর্ডিকরা তাদের আদি বাসস্থান থেকে দু'দলে বিভক্ত হয়ে, একদল পশ্চিমে ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় ও অপর দল ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রবেশদ্বার দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করে। এরাই রচনা করেছিল ঋগ্‌বেদ। ঋগ্‌বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা অবিরাম সংগ্রাম করেছিল দুর্গ ও প্রাচীরবেষ্টিত নগর-সমূহের অনার্য অধিবাসিগণের সঙ্গে। এই অনার্য অধিবাসীগণই সিন্ধু-সভ্যতার বাহক।

তিন

গোড়াতেই মনে রাখতে হবে যে ঋগ্‌বেদে কোন বিশেষ সময়ের সামাজিক বা নৃতাত্ত্বিক চিত্র নেই। ন্যূনপক্ষে ঋগ্‌বেদের সাতটা কাল-স্তর আছে। সুতরাং বিভিন্ন যুগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের চিত্র এতে পাওয়া যায়। এমন কি আর্যরা এদেশে আসবার আগের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের সন্ধানও এতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্‌টা কোন্ যুগের সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ অনুশীলন হয়নি।

আগেই বলেছি যে সিন্ধু-সভ্যতা ও আর্য-সভ্যতা সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন। সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগরভিত্তিক সভ্যতা। সুসভ্য ও সমৃদ্ধশালী সভ্যতার যে-সকল লক্ষণ, তার সবই বর্তমান ছিল সিন্ধু-সভ্যতার নগরসমূহে। অপরপক্ষে বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামভিত্তিক। আর্যরা ছিল যোদ্ধার জাত, আর সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা ছিল বণিকের জাত। এই বণিকদের ঐশ্বর্য ও ধনদৌলত আর্যদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার করেছিল। সেজন্য আর্য গ্রামবাসীরা সিন্ধু-সভ্যতার নগর-সমূহকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। নগরসমূহকে ধ্বংস করে বিজয় গৌরবের উন্মত্ততায়, তারা তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম রেখেছিল 'পুরন্দর'। আগেই বলেছি যে, আর্যরা ছিল বর্বর জাতি। বর্বর মানসিকতার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি থাকতে পারে?

ঋগ্‌বেদের পুরোহিতরা খুব আড়ম্বর-বহুল যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ডের সৃষ্টি

করেছিল, এবং রাজারাজড়ারা সেসকল যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ড করা মহাগৌরবের বিষয় বলে মনে করত। তখন পুরোহিতরা তাদের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করাত।

আর্যরা অশ্ব-বাহনে এদেশে এসেছিল। এদেশে অশ্ব ছিল না। তার প্রমাণ, সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোথাও অশ্বের কঙ্কাল পাওয়া যায়নি। সিন্ধু-সভ্যতার বাহকদের ছিল বলীবর্দ। সুতরাং আর্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে বলীবর্দের মন্থরতাই তাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মনে হয় আর্যরা যখন এদেশে এসেছিল, তখন তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল খুব কম। যোদ্ধার দলের তাই হওয়াই স্বাভাবিক। সেটা ঋগ্‌বেদখানা পড়লে বুঝতে পারা যায়। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে ঋগ্বেদের উৎপত্তি হলেও, সমগ্র ঋগবেদখানাতে উলঙ্গভাবে প্রকটিত হয়েছে দেবতাদের কাছে, তাদের একই বৈষয়িক প্রার্থনা—ঋগ্‌বেদের প্রায় ১০,০০০ মন্ত্রের মধ্যে হাজার মন্ত্রতে শুধু একটা কথাই বলা হয়েছে —"দাও আমাদের শত্রুর ধন, দাও আমাদের শত্রুর সম্পদ, দাও আমাদের শত্রুর গাভী, দাও আমাদের শত্রুর নারী" ইত্যাদি। সর্বত্রই বলা হয়েছে—"আমার শত্রুকে ধ্বংস কর, তাদের সকল ধন আমাদের দাও, অন্য কাউকে দিও না। কেবলমাত্র আমার মঙ্গল কর।" প্রথম মণ্ডলের পাঁচ-এর সূক্তে বলা হয়েছে—"শত্রুরা যাঁর রথযুক্ত অশ্বদ্বয়ের সম্মুখীন হতে পারে না, তিনি ইন্দ্র। আমাদের ধন প্রদান করুন, স্ত্রী প্রদান করুন, অন্ন নিয়ে আমাদের নিকট আগমন করুন।" (১৫।৩)। তার মানে এই তিনটা জিনিষের আর্যদের অভাব ছিল—ধন, স্ত্রী ও অন্ন। আবার আটের সূক্তে বলা হয়েছে—"হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষণার্থে সম্ভোগযোগ্য, জয়শীল, সদা শত্রুবিজয়ী, প্রভূত ধন দাও। (১।৮.১)। যে ধন দ্বারা নিরন্তর মুষ্টিপ্রহার দ্বারা আমরা শত্রুকে নিবারণ করব, অথবা তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে অশ্ব দ্বারা শত্রুকে নিবারণ করব, হে ইন্দ্র! তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করে, যুদ্ধে স্পর্ধাযুক্ত শত্রুকে জয় করব।" (১।৮।২-৩)। ছয়ের মণ্ডলে (৬।২৭।৫) উল্লেখিত হয়েছে, সৃঞ্জয় নামক আর্যগোষ্ঠী ইন্দ্রের সহায়তায় হরিয়ূপীয়ার (হরপ্পার ?) পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখবংশীয় যজ্ঞপাত্রধ্বংসকারী বৃচিবৎগণকে নিধন করেছিল। আটের মণ্ডলে (৮।৯৬।১৩) উল্লেখিত

হয়েছে যে অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ নামক জনৈক অসুর অধিপতি দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আর্যদের আক্রমণ করতে উদ্যত হলে আর্যরা তাদের পরাভূত করবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেছিল। দশের মণ্ডলে (১০।২২।৮) ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে—"আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞকর্ম করে না। তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মানুষের গণ্য নয়। তাদের নিধন কর"। ইন্দ্র, পিপ্রু নামক নগর ধ্বংস করেছিল (১।৫১।৫), ও শুষ্ণ, শম্বর ও অর্বুদ নামক অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল (১।৫১।৬; ১।১১।৭); ইন্দ্র বৈলস্থানকের (বেলুচিস্তানের?) অন্তর্গত মহাবৈলস্থনগর ধ্বংস করেছিল (১।১৩১।৩); এ ছাড়া ইন্দ্র সরস্বতী নদীর তীরস্থ নৈতন্ধব ও ব্যার্ন নামক নগরদ্বয় ও নারমনি নামক অপর এক নগরও ধ্বংস করেছিল, ইন্দ্র দৌ নামক অসুরকে বধ করেছিল; এ ছাড়া, ইন্দ্র দস্যু ও অনার্য শিম্যুদের (১০।১০০।১৮) প্রহার করেছিল ও দস্যুদের নগরসমূহ ধ্বংস করেছিল (১।১০৩।৩)। ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে শম্বরের পাষাণ-নির্মিত শতসংখ্যক পুরী প্রদান করেছিল (৪।৩০।২০)। বস্তুতঃ প্রথম মণ্ডলের ১।১২৯ হতে ১।১৩৩ সূক্তে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের যুদ্ধ ও বৈরিতার অনেক উল্লেখ আছে। মনে হয়, সিন্ধু-সভ্যতার বাহকগণের নগরসমূহ ধ্বংস করে আর্যরা তাদের শস্যাগার লুণ্ঠন করেছিল, কেননা আটের মণ্ডলে (৮।৯৭।১) বলা হয়েছে যে ইন্দ্র অসুরগণকে পরাভূত করে তাদের নিকট হতে অনেক ভোক্তব্য দ্রব্য আহরণ করেছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে আটের মণ্ডলের (৮।৯৭।২) প্রার্থনা—"ইন্দ্র, অসুরগণকে অশ্ব দিও না।" এর দ্বারা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে অশ্বের অনুপস্থিতিই ইঙ্গিত করে। ঋগ্বেদে অসুর জাতির বহু অধিপতির নাম আছে। তাদের অন্যতম হচ্ছে শম্বর, শুষ্ণ, অর্বুদ, কৃষ্ণ, এতশ, দশব্রজ, নবব্যস্ত ও বৃহথ (১০।৪৯।৬)।

কিন্তু আর্যদের এই গোড়ার দিকের বৈরিতা আর পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়নি। পঞ্চনদ থেকে তাঁরা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন, ততই তাঁরা এ দেশের লোকের সংস্পর্শে এলেন। তাঁরা এদেশের নারীকে বিয়ে করলেন। যখন অনার্য রমণী গৃহিনী হলেন, তখন ধর্মকর্মের ওপর তার প্রতিঘাত পড়ল। ক্রমশঃ বৈদিক যজ্ঞাদি ও বৈদিক দেবতাগণ পশ্চাতে অপসারিত হল। আর্য ও অনার্যের

সংশ্লেষণে পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর সৃষ্টি হল, এবং তথাকথিত আর্য ব্রাহ্মণগণই এই সকল নূতন দেবতার পত্তন করলেন।

চার

ইন্দ্রের কাছে আর্যদের পুনঃপুনঃ স্ত্রীধন পাবার প্রার্থনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে আর্যরা যে বিপর্যয়ের প্রতিঘাতে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিল তাতে তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি যথাযথ সংখ্যক স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে আসা। সেজন্যই এদেশের নারীদের ওপর তাদের অত্যন্ত লোভ ছিল, এবং তাদের পাবার জন্যই তারা ইন্দ্রের কাছে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করত। এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। 'পত্নী' অর্থে 'বধূ' শব্দের প্রয়োগ। 'বধূ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যাকে বহন করে আনা হয়েছে (বহ্ + উর্ম)। তার মানে যাকে কেড়ে আনা হয়েছে। নৃতত্ত্বের ভাষায় যাকে 'ম্যারেজ বাই ক্যাপ্চার' বলা হয়। আরও একটা জিনিষ বরাবর আমার কৌতূহল জাগিয়েছে। স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করা হত কেন? কোনও ইংরেজ বা জার্মান মহিলা তো কখনও স্বামীকে 'ওহে ইংরেজপুত্র' বা 'ওহে জার্মানপুত্র' বলে অভিহিত করে না। কোন বাঙালি মেয়েও তার স্বামীকে 'ওগো' বাঙালীর ছেলে' বলে সম্বোধন করে না। সেজন্য আমার মনে হয়, স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে অভিহিত করবার একটা গূঢ় অর্থ আছে। মনে হয় এটা সেযুগের সম্বোধনের প্রতিধ্বনি, যেযুগে স্বামী আর্য হতেন, আর স্ত্রী অনার্য হত এবং স্ত্রী গৌরবার্থে স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করত।

আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষণ ঘটেছিল সেখানে, যাকে আগে আমরা 'কুরু-পাঞ্চাল' দেশ বলতাম বা গঙ্গা যমুনা নদীদ্বয়ের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে। সেখানে আর্যদের আপোষ করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে। এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। এই সংশ্লেষণের পরে আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যেটা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্তুতিগান করে না। বৈদিক যজ্ঞও সম্পাদন করে না। নূতন

দেবতামণ্ডলীর পত্তন ঘটে। যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি। এর ওপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে।

আর্য চিন্তাধারার দ্বারা মণ্ডিত হয়ে, অনার্য দেবতাসমূহ পৌরাণিক যুগে সামনে এসে হাজির হয়। আর বৈদিক দেবতাসমূহ পশ্চাদ্‌ভূমিতে চলে যায়। বৈদিক ইন্দ্র তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে মাত্র পূর্বদিকের একজন দিকপালে পর্যবসিত হয়। নূতন দেবতামণ্ডলীর মধ্যে আসে ব্রহ্মা (যার উল্লেখ ঋগ্‌বেদে নেই), বিষ্ণু, শিব (যাকে আমরা সিন্ধুসভ্যতায় পাই) দুর্গা, কার্তিক, গণেশ; লক্ষ্মী, সরস্বতী (ঋগ্‌বেদে নদী হিসাবে স্তুত হত), শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা আরও কত কে। অবতারবাদের সৃষ্টি হয়, তাতে বুদ্ধও স্থান পান। অবতারবাদের মধ্যেই আমরা পাই আর্য ও অনার্য সংশ্লেষের ইতিহাস। বৈদিক দেবতাগণের স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু দেবতামণ্ডলীর মধ্যে তাঁদের কোন আধিপত্য ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে তাঁরাই হলেন দেবতাগণের শক্তির উৎস। শিবজায়া দুর্গা এগিয়ে এলেন 'দেবী' হিসাবে দেবতামণ্ডলীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে। তাঁর আঁচল ধরে এলেন অনার্য সমাজের সেইসমস্ত দেবী, যাঁরা আগে লুকিয়ে ছিলেন গাছতলায়, ঝোপ-জঙ্গলে ও পর্বত-কন্দরে। সেই সব দেবী সমপর্যায় লাভ করলেন—'দেবী'র সঙ্গে। বৈদিক যুগের আর্যরা যাদের শিশ্নোপাসক বলে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন ও যাদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্যন্ত সেই অনার্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহেরই জয় হল।

হিন্দুসভ্যতার গঠনে প্রাগার্যদের দান

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্বাধ্যক্ষ স্যার জন মারশালের অনুজ্ঞায় আমি পরবর্তীকালের হিন্দুসভ্যতার গঠনে সিন্ধুসভ্যতার অবদান সম্বন্ধে প্রথম অনুশীলন শুরু করি। পরে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের প্রেসিডেন্ট ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের আনুকূল্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈতনিক গবেষক হিসাবে ১৯২৯ হতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অনুশীলন চালিয়ে যাই। এ সম্বন্ধে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলাম, তার সারাংশ 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ও 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়াটারলি' পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশ করি। আমার প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করেই ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান কালচারেল কনফারেন্স'-এ তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন—"হিন্দুসভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভূত, এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রমাণ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন স্যার জন মারশাল', রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর।"—আমি নীচে সেই প্রতিবেদনের অংশবিশেষ (কোনরূপ পরিবর্তন না করেই) উদ্ধৃত করছি।

১. ॥ মাতৃদেবীর পূজা ॥ সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। সেজন্য মাতৃদেবীই ছিল এই সভ্যতার প্রধান দেবতা। (মাতৃদেবীর সহিত কৃষির সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখকের 'হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' দ্রঃ)। হরপ্পায় প্রাপ্ত এক সালের ওপর উৎকীর্ণ এক নারীমূর্তি যার যোনিমুখ থেকে লতা গুল্মাদি নির্গত হচ্ছে তা থেকে এটা আমরা বুঝতে পারি। পৌরাণিক যুগে মাতৃদেবীর অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী ইত্যাদি নাম ও দুর্গাপূজায় প্রতিমার পার্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপনও তাই ইঙ্গিত করে। সুমেরের প্রধান দেবতা এ-নান্না নামের সঙ্গে অন্নপূর্ণা নামের সাদৃশ্যও তাই সূচিত করে। বস্তুতঃ সুমের এবং ভারতের মাতৃদেবীর মধ্যে কতকগুলি মূলগত সাদৃশ্য দেখে কোন সন্দেহই থাকে না, যে এই উভয়দেশের মাতৃপূজা একই সাধারণ উৎস থেকে

উদ্ভূত হয়েছিল। এই সাদৃশ্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : (ক) উভয় দেশেই মাতৃদেবী 'কুমারী' হিসাবে কল্পিত হয়েছিলেন, অথচ তাঁদের ভর্তা ছিল ; (খ) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ ও তাঁর ভর্তার বাহন বলীর্বদ ; (গ) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর নারী-সুলভ গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরুষোচিত কর্ম, যেমন যুদ্ধ, করতে পারতেন ; (ঘ) সুমেরের লিপিসমূহে তাঁকে বারম্বার 'সৈন্য-বাহিনীর নেত্রী' বলা হয়েছে : মার্কণ্ডেয়পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' বিভাগেও বলা হয়েছে যে দেবতারা যখন, অসুরগণ কর্তৃক পরাহত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা মহিষাসুরকে বধ করবার জন্য দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছিলেন : (ঙ) সুমেরের মাতৃদেবী পর্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য তাঁকে 'পর্বতের দেবী' বলা হত ; ভারতের মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী, বিন্ধ্যবাসিনি প্রভৃতি নাম তাই সূচিত করে ; (চ) সুমেরে দেবীর নাম ছিল 'নানা' ; সে নাম হিংলাজে নানাদেবীর নামে এখনও বর্তমান ; (ছ) যাঁরা বলেন যে সুমেরীয়দের পরিধেয় বসন 'কৌনক' তালপাতা দিয়ে তৈরি করা হত, তাঁরা প্রাচীন ভারতে দেশজ লোকদের পাতা ও বল্কল পরিধান ও পর্ণশবরীর কথা স্মরণ করবেন ; (জ) দু'দেশেই ধর্মীয় গণিকাবৃত্তি (বা সাময়িকভাবে সতীত্বের বিসর্জন দেওয়া) প্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিম এশিয়ায় এটার উদ্ভব হয়েছিল ঐন্দ্রজালিক (mimetic বা homoeopathic magic) পদ্ধতি থেকে। সধবা ও অনূঢ়া উভয়শ্রেণীর মেয়েরাই দেবীর প্রসন্নতা লাভ করবার জন্য সাময়িকভাবে তাদের সতীত্বের বিসর্জন দিত। বলা বাহুল্য, ভারতে এটা বামাচারী তন্ত্রধর্মের বৈশিষ্ট্য। সব তন্ত্রেই বলা হয়েছে যে 'মৈথুন' ছাড়া 'কুলপূজা' (তন্ত্র অনুযায়ী দেবীর পূজা) হয় না। যেমন 'গুপ্তসংহিতা'য় বলা হয়েছে : "কুলশক্তিম্ বিনা দেবী যো জপেত স তু পামর।" আবার 'নিরুত্তরতন্ত্র'-এ বলা হয়েছে : "বিবাহিতা পতি ত্যাগে দুষণম্ ন কুলার্চনে।" তার মানে কুলপূজার জন্য সধবা স্ত্রীলোক যদি তার স্বামী পরিত্যাগ করে, তবে তার কোন দোষ হয় না। (ঝ) উভয়দেশেই দেবীপূজার সঙ্গে নরবলি প্রচলিত ছিল (কালিকাপুরাণ, ৬৭ অধ্যায়)। (অতুল সুর, 'ক্যালকাটা রিভিউ', মে ১৯৩১)।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরে দেবীপূজার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল, তা মৃন্ময়ী মাতৃকাদেবীর মূর্তিসমূহ থেকে প্রকাশ পায়। পুরুষ-

দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত ঋগ্‌বেদের দেবতামণ্ডলীতে, মাতৃদেবীর কোন স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে যখন সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছিল, তখনই প্রাগার্য দেবীসমূহের হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন, বৈদিক যুগের অন্তিমে আমরা কালী, করালী প্রভৃতি দেবীর নাম পাই। কিন্তু তখনও তাঁরা তাঁদের মৌলিক স্বরূপ বা স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে অনুপ্রবেশ করতে পারেন নি। তাঁরা বৈদিক অগ্নি উপাসনারই অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। কিন্তু আর্যরা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, তাঁদের ধর্মীয় গোঁড়ামী ততই হ্রাস পেতে লাগল। তখন এইসব অনার্যদেবতা বেশ রীতিমত হানা দিয়ে হিন্দুধর্মমণ্ডলীতে তাঁদের আসন করে নিলেন। পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা বিন্ধ্যবাসিনী, পর্ণশবরী প্রভৃতি দেবীকে হিন্দুদেবীর স্বরূপেই পাই। তারপর প্রাগার্য তন্ত্রধর্মও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রভাবান্বিত করে।

বর্তমানে হিন্দুধর্মে গ্রাম-দেবীসমূহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রাগার্য যুগেও তাঁদের অনুরূপ আধিপত্য ছিল। বর্তমান ভারতের প্রত্যেক গ্রাম বা শহরে আমরা কোন না কোন দেবীর 'থান' বা প্রতীক দেখতে পাই। এসব প্রাগার্য দেবীসমূহ এখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব দ্বারা মণ্ডিত হয়েছেন।

যদিও বৈদিক ধর্মে মাতৃপূজার কোন স্থান ছিল না, তথাপি মাতৃ-পূজার উদ্ভব প্রাচ্য ভারতের প্রাগার্য জাতিসমূহের মধ্যে যে হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কোন কোন গৃহ্যসূত্রে আমরা সাধারণ লোকগণ কর্তৃক পূজিত দুটো একটা দেবীর উল্লেখ পাই: তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় 'বাসিনী', যাঁকে আমরা বিন্ধ্যবাসিনী নামের মধ্যে পাই। এঁরা পূজিত হতেন সন্তান-সন্ততি ও আয়ু লাভের জন্য। এঁরা যে সকলেই প্রাগার্য দেবীসমূহেরই উত্তরস্বরূপা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ভারতের আর এক লোকায়ত দেবী ছিলেন 'শ্রী'। 'শতপথব্রাহ্মণ'-এ, আমরা তাঁর প্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে তাঁকে প্রণয় ও উর্বরতার দেবী বলা হয়েছে, এবং খুব অর্থবহভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য শয্যার মাথার দিকে রাখা হত। বৈদিক যুগের একেবারে অন্তিমকালের পূর্ব পর্যন্ত কোথাও বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উল্লেখ নেই। 'সিরি কালকণ্ণিজাতক' অনুযায়ী 'সিরি দেবী' হচ্ছেন চারজন

লোকপালের অন্যতম 'ধৃতরাষ্ট্র-এর কন্যা। সেখানে 'সিরি দেবী'কে আমরা বলতে দেখি: "মানব জাতির ওপর আধিপত্য দেবার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমি; আমি জ্ঞান, সম্পদ ও সৌন্দর্যের দেবী। মহাভারত অনুযায়ী শ্রীদেবী প্রথমে দানবদের সঙ্গে বাস করতেন, পরে দেবগণের ও ইন্দ্রের সঙ্গে। মনে হয়, এরই মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে তিনি গোড়ায় প্রাগার্যগণ কর্তৃক পূজিত হতেন, এবং পরে ব্রাহ্মণ্য দেবতামণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন।

পৌরাণিক দেবতামণ্ডলী গঠিত হবার সময় এইসকল লোকায়ত দেবীগণ একে একে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে স্থান পেয়ে শিবজায়া মহাদেবী শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ হিসাবে পরিগণিত হলেন।

২। ॥ আদি-শিব ॥ সিন্ধু উপত্যকার প্রাগার্য অধিবাসিগণ যে মাত্র মাতৃদেবীর পূজা করতেন, তা নয়। প্রাচীন এশিয়ার প্রাচীন অধিবাসিদের ও বর্তমান কালের ভারতীয় হিন্দুদের মত তাঁরা সৃজন-শক্তির আধার হিসাবে এক পুরুষ দেবতারও উপাসনা করতেন। মহেঞ্জোদারো হতে যে তিনমুখবিশিষ্ট এক দেবতার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তার দ্বারা এটা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি সিংহাসনের ওপর আসীন, তাঁর বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক উন্নত। তাঁর এক পা অপর পায়ের ওপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, তাঁর দুটি হাত বিস্তৃত অবস্থায় হাঁটুর ওপর অবস্থিত। তিনি পর্যঙ্কআসনে উপবিষ্ট হয়ে, ধ্যানস্থ ও উর্ধ্বলিঙ্গ। তাঁর উভয় পার্শ্বে চার প্রধান দিক-নির্দেশক হিসাবে হাতি, বাঘ, গণ্ডার ও মহিষের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত। তাঁর সিংহাসনের নীচে দুটি মৃগকে পশ্চাদ্‌দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

এখানেই যে আমাদের আদি-শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ পরবর্তী কালের শিবের তিনটি মূলগত ধারণা আমরা এখানে দেখতে পাই—তিনি (১) যোগীশ্বর বা মহাযোগী, (২) পশুপতি ও (৩) ত্রিনেত্র।

বৈদিক রুদ্রদেবতা যে এই আদি-শিবেরপ্রতিরূপেই কল্পিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, ঋগবেদে বলা হয়েছে যে রুদ্র সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কার ধারণ করেন, এবং মহেঞ্জোদারোয় আমরা আদি-শিবের যে মূর্তি পেয়েছি, সেখানে আমরা আদি শিবকে বাহুতে ও কণ্ঠে অলঙ্কার ধারণ করতে দেখি। বৈদিক রুদ্র যে আর্যদের একজন

অর্বাচীন দেবতা ছিলেন, তা বুঝতে পারা যায় এই থেকে যে, সমগ্র ঋগ্‌বেদে তাঁর উদ্দেশ্যে মাত্র তিনটি স্তোত্র রচিত হয়েছিল, এবং অগ্নিদেবতার সঙ্গে তাঁর সমীকরণ করা হয়েছিল। আর্যরা যখনই তাঁদের দেবতামণ্ডলীতে কোন নূতন দেবতার পত্তন করতেন, তখনই অগ্নির সঙ্গে তাঁর সমীকরণ করে নিতেন। এটা কালী ও করালীর অনুপ্রবেশের সময়ও করা হয়েছিল, অথচ আমরা জানি যে কালী ও করালী অনার্য দেবতা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃতে 'রুদ্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্তবর্ণ, এবং দ্রাবিড় ভাষাতেও 'শিব' শব্দের মানে হচ্ছে রক্ত-বর্ণ। এছাড়া, শতপথব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে 'শর্ব' ও 'ভব' এই দেবতা-দ্বয় প্রাচ্যদেশীয় অসুরগণ ও বাহীকগণ কর্তৃক পূজিত হন। কিন্তু বাজসনেয়ী সংহিতায় এ দুটি দেবতা অশনি, পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, উগ্রদেব প্রভৃতির সঙ্গে আর্য দেবতামণ্ডলীতে স্থান পেয়ে অগ্নি দেবতার সঙ্গে সমীকৃত হয়েছেন। অগ্নিদেবতার সঙ্গে সমীকরণের ফলে শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে আমরা হর, মৃদ, শর্ব, ভব, মহাদেব, উগ্র, পশুপতি, শঙ্কর, ঈশান প্রভৃতি দেবতাকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে দেখি। বৈদিক রুদ্রাগ্নির উপাসনাই এটাকে সম্ভবপর করেছিল। এ সম্বন্ধে বেরিয়েডেল কীথের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"এ প্রশ্ন মনে উদয় হয় যে বৈদিক যুগের শেষের দিকের রুদ্র দেবতার মধ্যে আমরা একাধিক দেবতার সমন্বয় ও আর্য মানসিকতার ওপর অনার্য প্রভাব পাই কিনা? এটা নিশ্চয়ই সম্ভবপর যে কতকগুলি অরণ্য, পর্বত ও কৃষি সংক্রান্ত দেবতা বা মৃতাত্মা সম্পর্কিত দেবতা, বৈদিক রুদ্র দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শিবরূপে কল্পিত হয়েছিল। পরবর্তীকালের শিবের মধ্যে আমরা কৃষি সম্পর্কিত অনেক ধ্যান-ধারণা লক্ষ্য করি, এবং দেখতে পাই যে শিবের লিঙ্গপূজা যা ঋগ্‌বেদে নিন্দিত হয়েছে; তা হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ জনপ্রিয়; ভারতের আদিবাসিগণের মধ্যেও সেরূপ জনপ্রিয়।"

যাই হোক, রামায়ণ-এর যুগে আমরা 'শিব'কে সর্বোচ্চ দেবতা হিসাবে পূজিত হতে দেখি। কেননা, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আমরা কৌশল্যাকে বলতে দেখি—"ময়ার্চিতা দেবগণা শিবাদয়"।

৩. ॥ লিঙ্গ-যোনি পূজা ॥ হিন্দুধর্মে শিব ও শক্তি যে মাত্র নরাকারে পূজিত হন, তা নয়, লিঙ্গ ও যোনি—এই প্রতীক-চিহ্ন হিসাবেও

পূজিত হন। সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীরাও যে লিঙ্গ-যোনি উপাসক ছিলেন, তা সেখানে প্রাপ্ত মণ্ডলাকারে গঠিত প্রস্তর প্রতীক সমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়। এছাড়া, আমরা সেখানে প্রস্তরনির্মিত পুরুষ লিঙ্গের এক বাস্তবানুগ প্রতিরূপও পেয়েছি। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরাই যে ঋগবেদে বর্ণিত সমৃদ্ধশালী নগরসমূহের 'শিশ্নোপাসক' সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে 'অ্যানালস্ অফ্ দি ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্ট্যাল ইনষ্টিট্যুট' পত্রিকায় লিখিত এক প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম যে লিঙ্গ উপাসনা ভারতে তাম্রাশ্ম যুগের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ ভারতের আদিম অধিবাসিগণের ঐন্দ্রজালিক ধ্যান-ধারণায় এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। মাদ্রাজ মিউজিয়াম-এর 'ফুট কালেকশন'-এ নবোপলীয় যুগের একটি সুন্দর লিঙ্গের প্রতিরূপ আছে। এটা মাদ্রাজের সালেম জেলার শিবারয় পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছিল। এটা খুবই বাস্তবানুগ ও 'নীস' পাথরের তৈরি। সালেম জেলার শিবারয় পাহাড়ই একমাত্র স্থান নয়, যেখান থেকে নবোপলীয় যুগের লিঙ্গের প্রতিরূপ পাওয়া গিয়েছে। বরোদার নানা জায়গা থেকেও নবোপলীয় যুগের মৃৎ-নির্মিত লিঙ্গের প্রতিরূপ পাওয়া গিয়েছে। এগুলি সবই সৃজনশক্তি উৎপাদক ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে সংশ্লিষ্ট ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সম্প্রতি ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলান পিটফিল্ড ক্রীট দ্বীপের এক পর্বতের উপর থেকে ৫০টি মৃত্তিকা নির্মিত শিবলিঙ্গ পেয়েছেন, যার সঙ্গে বাঙলাদেশের মেয়েরা বৈশাখ মাসে শিবপূজার জন্য যে মাটির লিঙ্গমূর্তি তৈরি করে তার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

প্রৎসিলুসকি (Przyluski) 'আর্য ভাষায় অনার্য শব্দের ঋণ' নামক নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে 'লিঙ্গ' ও 'লাঙ্গল' এই শব্দদ্বয় অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত শব্দ, এবং ব্যুৎপত্তির দিক থেকে উভয় শব্দের অর্থ একই। তিনি বলেছেন যে পুরুষাঙ্গের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে 'লিঙ্গ' শব্দটি অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জগতের সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু প্রতীচ্যের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহে এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেছেন যে সংস্কৃত ভাষায় যখন শব্দ দুটি প্রবিষ্ট হল, তখন একই ধাতুরূপ ('লনগ্') থেকে লাঙ্গল, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ শব্দ উদ্ভূত হয়েছিল। অনেক

সূত্র গ্রন্থে ও মহাভারতে 'লাঙ্গুল' শব্দের মানে লিঙ্গ বা কোন প্রাণীর লেজ। যদি 'লাঙ্গল-লাঙ্গুল' এই সমীকরণ অনুমোদিত হয়, তা হলে এই তিনটি শব্দের (লাঙ্গল, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ) অর্থ-বিবর্তন (semantic evolution) বোঝা কঠিন হয় না। কেননা, সৃষ্টিপ্রকল্পে লিঙ্গের ব্যবহার ও শস্য উৎপাদনে লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে। অস্ট্রিক জাতির অনেক লোক ভূমিকর্ষণের জন্য লাঙ্গলের পরিবর্তে লিঙ্গসদৃশ খনন-যষ্টি ব্যবহার করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক হিউবার্ট ও ময়েস বলেছেন যে মেলেনেশিয়া ও পলিনেশিয়ার অনেক জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত খনন-যষ্টি লিঙ্গাকারেই নির্মিত হয়। মনে হয় ভারতের আদিম অধিবাসীরাও নবোপলীয় যুগে বা তার কিছু পূর্বে এইরূপ যষ্টিই ব্যবহার করত, এবং পরে যখন তারা লাঙ্গল উদ্ভাবন করল, তখন একই শব্দের ধাতুরূপ থেকে তার নামকরণ করল।

লিঙ্গের যেসব প্রতিরূপ আমরা পেয়েছি, তা দাক্ষিণাত্য ও বাঙলা দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। এটা খুবই বিচিত্র ব্যাপার যে একপ্রকার লিঙ্গ উপাসনা, যথা বাণলিঙ্গের উপাসনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নিবদ্ধ কিংবদন্তী অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। সূত্র সংহিতায় বলা হয়েছে যে দৈত্যরাজ বাণ মহাদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে একটি শিবলিঙ্গ তৈরি করে, তাঁর অর্চনা করতেন। শতবর্ষ এইরূপ পূজা করবার পর, মহাদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীত হয়ে তাকে এক বর দিয়ে বলেন—"আমি তোমাকে চোদ্দ কোটি বিশেষ গুণসমৃদ্ধ লিঙ্গ দিতেছি। এই সকল লিঙ্গ নর্মদা ও অন্যান্য পুণ্যসলিলা নদীতে পাওয়া যাবে। ভক্তগণকে এই সকল লিঙ্গ 'মোক্ষ' দান করবে'। হিমাদ্রি যাজ্ঞবল্ক্যকে উদ্ধৃত করে তাঁর 'চতুর্বর্গচিন্তামণি' গ্রন্থে বলেছেন যে—"এই সকল লিঙ্গ অনন্তকাল ধরে অবিরাম নর্মদা নদীর স্রোতে আবর্তিত হবে। প্রাচীন কালে নৃপতি বাণ ধ্যানস্থ হয়ে মহাদেবের আরাধনা করলে, মহাদেব প্রীত হয়ে লিঙ্গরূপ ধারণ করে পর্বতের উপর অবস্থান করেন। সেই কারণে এই লিঙ্গকে বাণলিঙ্গ বলা হয়। এক কোটি লিঙ্গের অর্চনা করে উপাসক যে ফল পাবেন, একটি বাণলিঙ্গ অর্চনা করলেও সেই ফলই পাবেন। নর্মদা নদীর তীরে প্রাপ্ত বাণলিঙ্গে অর্চনা করলে, মোক্ষ লাভ উপাসকের করায়ত্ত হয়।"

উপরের আলোচনা থেকে এখন এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে আর্যরা ভারতের আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে যে মাত্র লিঙ্গ উপাসনাই গ্রহণ করেছিল, তা নয়, 'লিঙ্গ' শব্দটাও গ্রহণ করেছিল। লিঙ্গ উপাসনা যে প্রাগার্য সভ্যতার অবদান, তা ঋগ্‌বেদে লিঙ্গ-উপাসকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও কটূক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

মনে হয় মহাকাব্যের যুগেই লিঙ্গ-উপাসনা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিল। সাহিত্যে আমরা এর সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ পাই রামায়ণে, সেখানে আমরা দেখি যে রাবণ সদাসর্বদা একটা স্বর্ণলিঙ্গ বহন করতেন। মহাভারতের অনুশাসন ও দ্রোণপর্বেও শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে। এখনও বাঙালী মেয়েরা শিবকে লিঙ্গরূপে পূজা করে।

মনে হয়, খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই লিঙ্গপূজা হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের রাণীগুণ্টা থেকে ছয় মাইল অদূরে গুডিমল্লম গ্রামে প্রাপ্ত একটি শিবলিঙ্গ থেকে এটা প্রমাণ হয়। এটা লিঙ্গেরই অত্যন্ত বাস্তবানুগ প্রতিরূপ এবং এর গায়ে শিবের একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত আছে। পরবর্তী কালে শক্তিধর্মের অভ্যুত্থানের পর লিঙ্গপূজার বিশেষভাবে বিকাশ ঘটে। তন্ত্রগ্রন্থসমূহের সর্বত্রই বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে সমস্ত ধর্মীয় পুণ্যই বৃথা যাবে, যদি না লিঙ্গপূজা করা হয়।

৪। ॥ সূর্যপূজা ॥ ভূমিকর্ষণের উপর সৌরশক্তির প্রভাব মানুষ বরাবরই লক্ষ্য করেছে। এ কারণেই কৃষির প্রাচীন কেন্দ্রসমূহে, আমরা মাতৃকাদেবীর পূজার সঙ্গে সূর্যপূজার সংযোগ লক্ষ্য করি। যেহেতু সিন্ধু উপত্যকায় মাতৃপূজার প্রচলন ছিল, এটা খুব স্বাভাবিক যে সেখানে সূর্যপূজারও অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কয়েকটি সীলমোহরের ওপর আমরা চক্র ও স্বস্তিক চিহ্ন লক্ষ্য করি। এগুলি সূর্যেরই প্রতীক চিহ্ন। কেননা, প্রাচীনকালে সূর্য নরাকারে পূজিত হতেন না, তাঁর চিহ্ন দ্বারাই উপাসিত হতেন। চক্র ও স্বস্তিক ছাড়া, সূর্যের অপর যা প্রতীক চিহ্ন ছিল, তা হচ্ছে মণ্ডলাকার চাকতি ও বলদ। সিন্ধু উপত্যকা ছাড়া, সূর্যের এসব প্রতীক চিহ্ন আমরা পেয়েছি মধ্য-প্রদেশের বালাঘাট মহকুমার গুঙ্গেরিয়া নামক স্থান থেকে। এখানে তামার তৈরি কুঠারের সঙ্গে আমরা রূপার চাকতি ও বলদের মাথারূপে

পরিকল্পিত চাকতি পেয়েছি। এই শেষোক্ত জিনিষগুলি সূর্যপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখনও মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া জাতি ধর্মীয় নৃত্যের সময় বৃষের মস্তকের মুখোশ পরিধান করে।

সূর্যপূজা অবশ্য বৈদিক আর্যগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আর্যগণ কতৃক সূর্য নরাকারে কল্পিত হতেন। বৈদিক সূর্যপূজা যে প্রাগার্য ধর্মকে কোনরূপে প্রভাবান্বিত করেছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। বরং পরবর্তী কালে আর্যদের সূর্যপূজা যে আগন্তুক মগ-ব্রাহ্মণ কর্তৃক আনীত সূর্যপূজা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। তবে প্রাগার্য সূর্যপূজা এখনও হিন্দুর লোকায়ত ধর্মের মধ্যে জীবিত আছে। বিহারের ছট পূজা ও বাঙলার ইতুপূজা ও রালদুর্গার ব্রত তার প্রমাণ।

৫। ॥ পশুপূজা ॥ ভারতের প্রাগার্য জাতিসমূহের ধর্মীয় ধ্যান ধারণার মধ্যে পশুপূজার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরে যে সকল সীলমোহর পাওয়া গেছে,তার ওপর একাধিক পশুর চিত্র খোদিত আছে। এইসকল সীলমোহরের ওপর লিপিও আছে, কিন্তু এই লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার চুড়ান্তভাবে না হওয়ায়, চিত্রিত পশুর সঙ্গে সীলমোহরগুলির সম্পর্ক এখনও অজ্ঞাত আছে।

এইসকল লিপির ঠিক তলদেশে ককুদবিশিষ্ট বৃষ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, বানর, হাতি প্রভৃতি জন্তুর প্রতিকৃতি খোদিত আছে। প্রত্যেকটি সীলমোহরের পিছনে একটা করে হাতল হিসাবে ব্যবহার করবার যোগ্য মুণ্ডিও আছে। সুতরাং সীলমোহরগুলি যে ছাপ মারবার জন্য ব্যবহৃত হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয়, লিপির দ্বারা মালিকের নাম ও জন্তু বিশেষের প্রতিকৃতি দ্বারা সে কোন 'টোটেম' ভুক্ত ছিল, তাই বোঝাত। 'টোটেম'-এর প্রচলন যে সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের মধ্যে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু-একটা অলীক জন্তুর চিত্র থেকে। প্রাগার্য ভারতীয়দের ধর্মে টোটেমের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তা বর্তমান ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে টোটেম-এর প্রচলন থেকেই বুঝতে পারা যায়। বর্তমান আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত অনেক টোটেমই হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, প্রভৃতি নগর থেকে প্রাপ্ত সীলমোহরের

ওপর খোদিত প্রাণিসমূহের সঙ্গে অভিন্ন। এই টোটেম প্রথা থেকেই পরবর্তী কালের হিন্দুধর্মে পশুপূজার উদ্ভব হয়েছিল।

ঋগ্‌বেদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মধ্যে টোটেমের কোন স্থান ছিল না। ইন্দো-ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যেও এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। পশুপূজার প্রবর্তন আর্যসমাজে অথর্ববেদের যুগে ঘটেছিল। এবং এই পশুপূজা থেকেই পরবর্তী কালে হিন্দু দেবদেবীর 'বাহন' এর উদ্ভব ঘটেছিল। (আমার অনুশীলনের মূল প্রতিবেদনে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও **Dynamics of Synthesis in Hindu Culture** দ্র).

পশ্চিম এশিয়ার দেবতাগণ প্রায়ই বৃষরূপে কল্পিত হতেন, এবং সেখানকার প্রাচীন সীলমোহরসমূহে নরাকার দেবতাগণকে বৃষ-শৃঙ্গের কিরীট ধারণ করতে দেখা যায়। সুমেরীয়রা তাদের সর্বোচ্চ দেবতাকে 'স্বর্গের বৃষ' বলে অভিহিত করত। সুমেরের প্রাচীন সীলমোহরের ওপর তাঁকে বৃষ-শৃঙ্গের কিরীট-পরা অবস্থায় ও তাঁকে বৃষ কর্তৃক অনুসঙ্গী হতে দেখা যায়। অসুর জাতির সর্বোচ্চ দেবতা 'অসুর'-ও বৃষরূপে কল্পিত হত। মনে হয় বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রের বৃষরূপ কল্পনা আর্যরা এইসকল প্রাগার্য জাতির কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিল। কেননা, মহেঞ্জোদারোয় আমরা আদি শিবের যে মূর্তি পেয়েছি, সেখানে আদি শিবকে আমরা বৃষ-শৃঙ্গের কিরীট পরিহিত অবস্থাতেই দেখি।

৬। ॥ হিন্দু দশাবতার ॥ প্রাগার্য পশুপূজা থেকেই যদি হিন্দু দেবতাগণের 'বাহন'-এর উদ্ভব হয়ে থাকে, তা হলে টোটেম-প্রথা থেকেই হিন্দুর দশাবতারের কল্পনা বিকশিত হয়েছিল। সম্ভবত হিন্দুর অবতার-সমূহ, এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়ক বা 'হিরো' ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্তত তিনজনকে যথা রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে আমরা সে ভাবেই জানি। অন্যান্য অবতারসমূহ যথা মীন, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, ওইরূপ সাংস্কৃতিক নায়কদের টোটেম-এর নাম থেকে যে উদ্ভূত এটা অসম্ভব নয়। কেননা, সুমেরীয় ট্র্যাডিশন অনুযায়ী সুমেরীয় সংস্কৃতির নায়ক 'নর-মীন' রূপ ধারণ করে পারস্য উপসাগর সন্তরণ দ্বারা অতিক্রম করে সুমেরের এরিডু নগরে উপস্থিত হয়েছিল। ভারত থেকেও তিনি যেতে পারেন, এবং তিনি হিন্দুর মৎস্যাবতারেরই এক বিকল্প সংস্করণ কিনা, তাও বিবেচ্য। এখানে কুঠারধারী মিশরীয় দেবতা 'রামন'-এর সঙ্গে পরশুরামকেও তুলনা করা যেতে পারে।

৭। ॥ নাগ পূজা ॥ প্রাগার্য ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করছে একটা উজ্জ্বল রঙের প্রলেপ-বিশিষ্ট মৃৎ অলঙ্করণ ফলক যার উপর চিত্রিত করা হয়েছে দুপাশে দুজন সর্পের ফণাধরী ভক্তবিশিষ্ট এক আড়াআড়িভাবে পা রেখে-বসা দেবতা, ঠিক যেভাবে তিন হাজার বছর পরে আমরা ভাস্কর্যে বুদ্ধকে অনুরূপ ভক্ত দ্বারা পূজিত হতে দেখি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সিন্ধু সভ্যতার এই নাগ-কিরীটধারী ভক্তগণ, পরবর্তী কালের ইতিহাসে ও উপকথায় উল্লেখিত নাগজাতির লোক ব্যতীত আর কেউই নন। নাগজাতি সম্পর্কে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা হয়ে গেছে। বর্তমানে নাগজাতির লোকেরা কাশ্মীরের সীমান্তে চেনাব ও ইরাবতী নদীর মধ্যস্থ ভূখণ্ডে বাস করে। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে নাগ-রা একসময় পাঞ্জাবের খুব প্রভাবশালী জাতি ছিল। তারা সাপের ফণার চন্দ্রাতপের তলায় অবস্থিত এক নরাকার দেবতার পূজা করে। এই দেবতা বহু নামে পরিচিত যথা, নাগ, বাসুকী, বাসদেও, বাসকনাগ, তক্ষক, তখত নাগ, ইন্দ্রনাগ, নহুষ ইত্যাদি। তারা ভয়াবহ সরীসৃপ বা কোন প্রতীক হিসাবে পূজিত হন না। তাঁরা পূজিত হন এক প্রাচীন জাতির দেবতুল্য রাজা হিসাবে, যাদের টোটেম বা প্রতীক ছিল নাগ বা সর্প। এদের প্রধান দেবতা ছিল সূর্য, কেননা, সমস্ত নাগ-ধর্মস্থানেই সূর্যের প্রতীক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এইসকল দেবতুল্য রাজারা সূর্যেরই বংশধর বলে পরিগণিত হন। এই জাতির নাম কিন্তু 'নাগ' জাতি নয়, তারা 'তক্ষক' নামে পরিচিত—যেটা নাগ বা সর্পেরই প্রতিশব্দ 'তক্ষক'-এর একটা রূপ। এক সময়ে তারা পাঞ্জাবে খুব শক্তিশালী জাতি ছিল, এবং তাদের নগর বা রাজধানী তক্ষশিলা নামে পরিচিত ছিল। আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেছিলেন, তখন তক্ষশিলার রাজা Taxiles তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। Taxiles নামটি খুবই অর্থবহ। পুরু জাতির রাজাকে গ্রীকরা যেমন Porus নামে অভিহিত করেছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই 'তক্ষস' জাতির রাজাকে তাঁরা Taxiles বলেছেন। তক্ষসদের একজন দেবতুল্য নায়কের নাম হচ্ছে তক্ষকনাগ। তক্ষকনাগের কীর্তিকলাপ আমরা মহাভারত পাঠে জানতে পারি। তক্ষসরা খুব প্রাচীন জাতি ছিল, কেননা, নাগপূজার পদ্ধতি প্রাচীন মিশরীয়দের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সূচিত করে। যথা,

নাগদেবতাগণের হাতে 'গঞ্জ' নামে যে দণ্ড থাকে, তা ঠিক প্রাচীন মিশরীয় দেবতা অসিরিস (খনম)-এর হাতের দণ্ডের মত।

সিন্ধু সভ্যতা যে অবৈদিক, তা এই নাগ-পূজা থেকেই প্রমাণিত হয়। ঋগ্‌বেদে নাগপূজার কোন উল্লেখ নেই। যজুর্বেদেই আমরা এর প্রথম উল্লেখ পাই। অথর্ববেদেও মার্গশীর্ষের পূর্ণিমার দিন সর্পকে প্রশমিত করবার জন্য নানারকম ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার কথা আছে। শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে গন্ধর্বদের সঙ্গে নাগদের দেব-যোনি বিশেষ বলা হয়েছে যাদের আবাসস্থল পৃথিবীতেও নয়, স্বর্গেও নয়। সূত্র গ্রন্থসমূহেই আমরা প্রথম মানবরূপী নাগদের (বোধ হয় সর্প তাদের টোটেম ছিল) উল্লেখ দেখি। পরবর্তীকালের হিন্দু ধর্মে নাগপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। যেহেতু ঋগ্‌বেদে এর উল্লেখ নেই এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচলন আছে, সেহেতু আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে হিন্দুরা নাগপূজা প্রাগার্য যুগ থেকেই পেয়েছে।

৮। ॥ অশ্বত্থ পূজা ॥ সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহর-সমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাগার্যরা অশ্বত্থ বৃক্ষের বিশেষ আরাধনা করত। সারা ভারতের প্রাগার্য ও হিন্দুগণ এখনও অশ্বত্থ বৃক্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। তাদের সকলেরই ধারণা যে মৃতের আত্মাসমূহ অশ্বত্থ বৃক্ষে বাস করে।

ঋগ বৈদিক ধর্মকর্ম ও উপকথার মধ্যে বৃক্ষপূজার কোন স্থান নেই। অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা অথর্ববেদেই প্রথম লক্ষ্য করি। তৈত্তিরীয়সংহিতায় বলা হয়েছে যে অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ, উদুম্বর ও প্লক্ষবৃক্ষসমূহ অপ্সরা ও গন্ধর্বদের আবাস স্থল। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহেও বৃক্ষকে মৃতের আত্মার ও ভূতপ্রেতের আবাসস্থান বলা হয়েছে। বর্তমানকালেও হিন্দুরা অশ্বত্থ বৃক্ষকে মৃতের আত্মার ও উর্বরাশক্তিদায়িনী নানা দেবীর আবাসস্থান বলে বিশ্বাস করে ও মেয়েরা সন্তান কামনায় অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় নানারকম কামনামূলক পদার্থ বেঁধে দেয়।

৯। ॥ মৃতের সংকার ॥ মৃতের সংকার সম্বন্ধে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে দাহ ও সমাধি—এই উভয় প্রথারই প্রচলন দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, যেসব জাতির লোক হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরসমূহে বাস করত, তাদের মধ্যে মৃতের সংকার সম্বন্ধে

বিভিন্ন প্রথার প্রচলন ছিল। তবে আগে যে লোকের ধারণা ছিল যে মৃতকে দাহ করার প্রথাটা হিন্দুরা আর্যদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, সেটা ভুল। এটা প্রাগার্য যুগ থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল। এছাড়া, তাম্রাশ্ম যুগের লোকেরা (এমন কি নবোপলীয় যুগের লোকেরাও) বিশ্বাস করত যে মানুষ ইহজগতে যেরূপ জীবন যাপন করে, মৃত্যুর পরও পরলোকে অনুরূপ জীবন যাপন করে। এটা সমাধির মধ্যে মৃৎপাত্র ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসসমূহের বিদ্যমানতা থেকে বুঝতে পারা যায়। এ ছাড়া, বর্তমান কালের হিন্দুর সমাধির ন্যায় হরপ্পাতেও সমাধিস্থলের উপর ইষ্টক নির্মিত সমাধি-স্মৃতিসৌধসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়।

১০। ॥ শিল্প ও স্থাপত্য ॥ শিল্প ও স্থাপত্য ক্ষেত্রেও প্রাগার্য জাতিসমূহের অবদান কম নয়। ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য আর্যদের প্রতিভা-প্রসূত, এ সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ভ্রান্ত। আর্যরা যখন প্রথম পঞ্চনদে এসে উপনীত হয়েছিল, তখন তারা এদেশের লোকের সঙ্গে ভীষণ বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু তারা যত পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছিল, ততই বিপরীত নীতি অবলম্বন করেছিল। তারা এদেশের মেয়েদের তখন বিবাহ করতে আরম্ভ করেছিল, এবং তার ফলে এক সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক অনুরূপ সংশ্লেষণ ঘটেছিল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পাঞ্জাবেই আর্য-প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন-সমূহের অবস্থান পর্যালোচনা করলে যে বিচিত্র ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করি তা হচ্ছে পাঞ্জাব থেকে আমরা যতই দূরে যাই, ততই শিল্প ও ভাস্কর্য নিদর্শনের সংখ্যা বেশি পরিমাণে দেখি। ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য যে আর্য-চিন্তাধারা বা শিল্পিক প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত নয় এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর কারণ ঋগবৈদিক আর্যদের মধ্যে প্রতিমা পূজা ও মন্দির নির্মাণ রীতি ছিল না।

অলংকরণের মনোহারিত্বের জন্য ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের যে খ্যাতি আছে, তা উত্তর ভারতেই সবচেয়ে দুর্বল ও দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে সবল। এটা আমরা দক্ষিণের অমরাবতীর ভাস্কর্যসমূহের ছন্দময় মাধুর্য থেকেই বুঝতে পারি। বস্তুতঃ তক্ষশিলায় খননকার্যের ফলে আমরা

জানতে পেরেছি যে গ্রীকদের আগে পাঞ্জাব (যেখানে আর্যদের বসতি ছিল) অঞ্চলে কোন শিল্প বা ভাস্কর্যের ধারা ছিল না।

কিন্তু প্রাগার্য হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরে আমরা শিল্প ও স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন পাই। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর লোকেরা মূর্তি ও মন্দির দুই-ই তৈরি করত। এ ছাড়া, আর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি। পরবর্তী কালে হিন্দু মন্দিরের সংলগ্ন একটা করে পুষ্করিণী থাকত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতেও ঠিক তাই ছিল। মন্দিরের সংলগ্ন পবিত্র পুষ্করিণীখনন যে প্রাগার্য প্রথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

১১. ॥ লিপির উৎপত্তি ॥ সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যে লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা সীলমোহরসমূহ থেকে পেয়েছি। বর্তমান ভারতে প্রচলিত অধিকাংশ লিখন-প্রণালীই ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। এখন পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে ব্রাহ্মী লিপি সিন্ধুসভ্যতার লিখন-প্রণালী থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। ব্যাস যখন মহাভারত রচনা করেছিলেন, তখন তিনি গণেশ বা বিনায়ককে লিপিকর নিযুক্ত করেছিলেন। এরই মধ্যে কি ভারতের লিখন প্রণালীর দেশজ উদ্ভবের আভাস নেই? কেননা, আমরা জানি যে গণেশ বা বিনায়ক দেশজ দেবতামণ্ডলী থেকে গৃহীত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবতা-মণ্ডলীতে গণেশের উদ্ভব অর্বাচীন। রামায়ণ এবং অনেক পুরাণে গণেশের উল্লেখ নেই। আদি মহাভারতেও গণেশের নাম নেই। তার নাম আমরা প্রথম পাই যাজ্ঞবল্ক্যে—তাও দেবতা হিসাবে নয়, রাক্ষস বা অসুর হিসাবে এবং মানুষের সকল কর্মের সিদ্ধিনাশক হিসাবে। বিনায়ক নামে এক শ্রেণীর রাক্ষসের নামও আমরা প্রাচীন সাহিত্যে পাই। মনে হয়, আর্যদের মধ্যে কোনরূপ লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল না, এবং সেই হেতু যখন তাঁদের একজন লিপিকরের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তাঁরা বিনায়ক নামধারী এক দেশজ জাতির কাছ থেকেই এক লিপিকরের সাহায্য নিয়েছিল। লিপিকর হিসাবে তিনি আর্যদের যে প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন, তার জন্যই ব্রাহ্মণ্য দেবতামণ্ডলীতে তাঁকে দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছিল। তখন যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধিনাশক রাক্ষস, সিদ্ধিদাতা দেবতা হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন।

এ ছাড়া, এ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন বরাবরই আমার মনে জেগেছে।

সেটা হচ্ছে, তথাকথিত আর্যসমাজে বড় বড় পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও বেদ সঙ্কলন বা পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ একজন অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল কেন? এই কিংবদন্তীর মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির এক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।

বস্তুতঃ ভারতীয় সভ্যতা তথা হিন্দুসভ্যতার সূচনা হয়েছিল আদি মহাভারতীয় যুগে। আদি মহাভারতীয় যুগের সভ্যতা যে প্রাক্-বৈদিক ও সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন তার সপক্ষে যুক্তিসমূহ আমি আমার 'মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা' (উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৮) গ্রন্থে দিয়েছি। জিজ্ঞাসু পাঠক সে বইখানা পড়ে নিতে পারেন। এখানে মাত্র বলা যেতে পারে যে যুধিষ্ঠির যে সিন্ধুসভ্যতার লিপিযুক্ত সীলগুলি দেখেছিলেন তার উল্লেখ মহাভারতে আছে।

১২. ॥ সিদ্ধান্ত ॥ যেটা আমি এখানে দেখাতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে সিন্ধু উপত্যকায় বসবাসকারী প্রাক্-আর্যরা বৈষয়িক অভ্যুদয়ের দিক থেকে আর্যদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। কিন্তু প্রজ্ঞার দিক থেকে প্রাক-আর্যরা আর্যদের সমকক্ষ ছিল না। তা ছাড়া, আর্যদের ভাষা এত উন্নত ছিল যে, এই ভাষাতেই একমাত্র উচ্চ সূক্ষ্ম চিন্তা সম্ভবপর ছিল। ফলে এ ভাষার প্রভাবে এমন এক মননশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল, যার প্রতিফলন দেখা যায় ঋগ্‌বেদীয় ধর্মানুষ্ঠানে। অন্যদিকে মূর্তিপূজা প্রাগার্যদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং আর্যরা প্রাগার্যদের কাছ থেকে মূর্তিপূজা পেয়েছিল। প্রাগার্যদের ধর্মাচরণ পদ্ধতি যখন হিন্দুধর্মে স্বীকৃত হল, তখন ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এক নূতন সংস্কার দেখা দিল। সেই নূতন সংস্কারই, পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হল।

গণিত বিদ্যার বিভিন্ন শাখা ও দশমিক প্রথা যে ভারত থেকেই অন্যান্য দেশে গিয়েছিল, তা অনেক আগেই পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এসব বিদ্যা যে আর্যদের এদেশে আসবার আগেই ভারতে অনুশীলিত হত, তার প্রমাণ আমরা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে পেয়েছি। সিন্ধুসভ্যতা যে বাণিজ্যিক সভ্যতা, এটা সর্বজনস্বীকৃত। ষাট বছর আগে আমি অনুমান করেছিলাম যে বাণিজ্যের লেনদেন লিপিবদ্ধ করবার জন্য সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের মধ্যে হিসাবরক্ষণ প্রথা ছিল। (বর্তমান লেখকের 'ফরেন ট্রেড অভ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া' মডার্ণ রিভিউ', জানুয়ারি ১৯৩৭ পৃষ্ঠা -১০০ দ্রষ্টব্য।) এটা সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার যে হিসাবরক্ষণের জন্য সংখ্যার ব্যবহার নিশ্চয়ই ছিল।

বস্তুতঃ তাম্রাশ্মযুগে সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, তার ধারকদের যে পাটিগণিত, দশমিক গণন ও জ্যামিতির বিশেষ রকম জ্ঞান ছিল, তার বহুল নিদর্শন আমরা পেয়েছি। দৈর্ঘ্য মাপবার জন্য তারা যে দশমিক প্রথা ব্যবহার করত, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি সরু shell-এর ওপর ৬.৭ মিলিমিটার অন্তর দাগ দেওয়া একটা মাপকাঠি থেকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা ঋজু (vertical) ও অনুভূমিক (horizontal) রেখা-দাগ দ্বারাই সংখ্যা গণনা করত। পরবর্তী কালের খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি প্রণালীতেও এরূপ দাগ দ্বারাই সংখ্যা বোঝানো হত। এমন কি, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাপ্ত ইটসমূহের মাপের ঐক্য থেকেও বুঝতে পারা যায় যে ওই সভ্যতার ধারকরা গণিতবিদ্যার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। এ ছাড়া, পাশাখেলার ঘুঁটির ওপরও আমরা এক থেকে ছয় পর্যন্ত সংখ্যাবাচক দাগ দেখি।

উপরে যে shell-নির্মিত মাপদণ্ডের কথা বলা হয়েছে, তা ছাড়া, ওজন নির্ণয়ের জন্য, পাথরের বাটখারার প্রচলন ছিল। এরকম অনেক বাটখারা পাওয়া গিয়েছে। একরকম ছোট বাটখারা পাওয়া গিয়েছে, যেগুলো cube আকারের। এই শ্রেণীর বাটখারার সবচেয়ে ভারি ওজন হচ্ছে ২৭৪'৯ গ্রাম। আর এক রকম গোলাকার ভারি

ওজনের বাটখারা পাওয়া গিয়েছে, যার সবচেয়ে ভারি বাটখারার ওজন হচ্ছে ১১ কিলোগ্রাম। ওজন প্রথা ০·৮৫৬৫ গ্রাম ওজন এককের (unit) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং এই ভিত্তিরই ⅙, ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০, ১২৮০০ গুণিতকে বাটখারাগুলো তৈরি হত। ওজনপাল্লার যে নমুনা পাওয়া গিয়েছে, তা আজকালকারই মত। একটা ব্রোঞ্জনির্মিত দাঁড়ের দুদিকে তামার পাত্র ঝুলানো থাকত।

রাস্তাঘাট নির্মাণের সমান্তরালতা ও 'কোন্' (angle) সমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের জ্যামিতিক জ্ঞানও বিলক্ষণ ছিল। নগরগুলি দুই সমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট চতুর্ভুজের আকারে গঠিত হত, এবং তার জন্য রীতিমত জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হত। মৃৎপাত্র ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর ওপর অঙ্কিত নক্‌শাসমূহ থেকেও আমরা তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় পাই। অস্ত্রশস্ত্র ও কুঠার প্রভৃতির অন্তর্বর্তী সামঞ্জস্যও তাদের জ্যামিতিক জ্ঞান নির্দেশ করে। বৃত্তাঙ্কন যন্ত্রও (compass) যে ব্যবহৃত হত, তা অনেক সামগ্রীর ওপর অঙ্কিত সমান্তরাল বৃত্তাকার রেখাসমূহ থেকে প্রকাশ পায়।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাপ্ত তামার পাত। সাইজ অর্ধেক

সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আমরা কতকগুলি তামার পাতলা, সরু ও লম্বা পাত (যার মাপ হচ্ছে, ৩'০ × ১'৯ সেন্টিমিটার থেকে ৩'৮ × ২'৪ সেন্টিমিটার) পেয়েছি, যার এক পিঠে লিপি ও অপর পিঠে কোন জন্তু বা মানুষের প্রতিকৃতি খোদিত আছে। রাখালদাস এগুলিকে মুদ্রা বলে ভুল করেছিলেন, কেননা মুদ্রা হলে এগুলির সমপরিমাণ ওজন থাকা চাই। এগুলির তা নেই। আমরা এগুলিকে তাবিজ বলে মনে করি। বোধ হয় এগুলি গ্রহশান্তির জন্য ব্যবহৃত হত। মনে হয় পাতগুলির একপিঠে মন্ত্র ও অপর পিঠে সেই গ্রহের রাশিচিহ্নের প্রতিকৃতি থাকত। যে সকল প্রতিকৃতি আমরা পেয়েছি, তা থেকে মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ, কুম্ভ, ধনু ও মীন রাশি-চিহ্নের প্রতিকৃতি সহজেই চিনতে পারা যায়। গ্রহশান্তি করতে হলে জাতকের কোষ্ঠী বিচার একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য গণনার দরকার। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে গণিতশাস্ত্রের যে অনুশীলন হত তা সহজেই অনুমেয়। তবে এগুলো identity card ও হতে পারে, যার উল্লেখ মহাভারতে আছে।

সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা যে মাত্র গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন তা নয়। তারা ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও ধাতু বিদ্যাতেও পারঙ্গম ছিলেন। ধাতু বিদ্যাতে তাদের পারদর্শিতা, ধাতুগলনের জন্য কয়েকটি চুল্লি ও মুচি থেকে প্রকাশ পায়। এছাড়া তারা চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদও ছিল। টিন ব্যবহারের পূর্বে তারা আর্সেনিক দিয়ে ব্রোঞ্জ (bronze) তৈরি করত। এরজন্য আর্সেনিক ঘটিত নানারূপ ব্যাধি দ্বারা তারা আক্রান্ত হত এবং সে সব ব্যাধির চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। একটি করোটিতে এক ছিদ্র থেকে বোঝা যায় যে শল্য চিকিৎসাতেও তারা পারদর্শী ছিল। আর একটি কঙ্কাল থেকে প্রকাশ পায় যে তাদের ক্যানসার রোগও হত এবং তার চিকিৎসারও তারা চেষ্টা করতেন।

সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা কোন নরগোষ্ঠীর লোক?

সিন্ধু সভ্যতার যখন প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল,তখন সিন্ধু উপত্যকায় কোন্ নরগোষ্ঠীর লোক বাস করত, সে সম্বন্ধে আমি বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে আলোচনা করেছিলাম। (Who were the Authors of Mohenjodaro culture ? 'Indian Culture,' 1933'।)

তারপর সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্নকেন্দ্রের সমাধিস্থানসমূহ থেকে আমরা অনেকগুলি নরকঙ্কাল পেয়েছি। তা থেকে আমরা জানতে পারি যে (১) হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও লোথালের লোকরা অধিকাংশই দীর্ঘশিরস্ক ও বিস্তৃতনাসা ছিল, তবে মহেঞ্জোদারোর লোকদের নাক হরপ্পা বা লোথালের মত অত বিস্তৃত ছিল না। (২) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর তুলনায় লোথালের লোকদের মাথা চওড়া ছিল। (৩) এই সকল পার্থক্য যথা—মাথার খুলির আকার, নাকের গঠন-ও- আকারের দিক থেকে বোঝা যায় তারা সকলে একই নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (৪) তারা দীর্ঘশিরস্ক, প্রশস্তনাসা ও আকারে লম্বা ছিল বটে, কিন্তু হরপ্পা যুগে গুজরাটে ও সিন্ধুপ্রদেশে এক বিস্তৃতশিরস্ক জাতিরও অস্তিত্ব ছিল। (৫) ব্রহ্মগিরি, নাগার্জুনকুণ্ড, পিকলিহাল, মাসকী ও ইল্লেশ্বরম থেকে মেগালিথিক যুগের প্রাপ্ত নরকঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে মেগালিথ (সমাধিস্তুপের উপর স্মৃতিফলক) নির্মাণকারীরা অধিকাংশই বিস্তৃতশিরস্ক, আকারে লম্বা ও দৃঢ় দেহবিশিষ্ট লোক ছিল। (৬) কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের আদিচান্নালুরের ও দক্ষিণ ভারতের সমাধিস্তূপগুলিতে যে সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তারা দীর্ঘশিরস্ক ও নাতিদীর্ঘশিরস্ক ছিল। (৭) উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী ও তক্ষশিলা হতে প্রাপ্ত কঙ্কাল-সমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে এই সকল স্থানে দীর্ঘশিরস্ক জাতির লোকরাই বাস করত, এবং পরে সেখানে এক বিস্তৃতশিরস্ক জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

সুতরাং এই সকল সিদ্ধান্ত থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, (১) নবোপলীয় যুগের লোকরা দীর্ঘশিরস্ক ছিল। (২) হরপ্পা ও

অন্যান্য তাম্রাশ্মযুগের লোকরা দীর্ঘশিরস্ক ও নাতিদীর্ঘশিরস্ক ছিল। কিন্তু গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশে বিস্তৃতশিরস্ক জাতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। (৩) মেগালিথিক যুগের লোকরা বিস্তৃতশিরস্ক ছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিস্তৃতশিরস্ক জাতিসমূহের অনুপ্রবেশ পরে ঘটেছিল। এখানে বক্তব্য যে বাঙলার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে তা দীর্ঘশিরস্ক। তারা যে ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর লোক, তা এখানে প্রাপ্ত ক্রীট দেশীয় এক সীলমোহর দ্বারা সমর্থিত হয়। যেহেতু বাঙলার লোকরা বিস্তৃতশিরস্ক, সেই হেতু মনে হয় যে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে বাণিজ্য হেতু আগত ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর লোকদের একটা উপনিবেশ ছিল।

সে যাই হোক, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল প্রভৃতি নগরসমূহ বাণিজ্যকেন্দ্রিক cosmopolitan cities ছিল। সেই হেতু এই সকল নগরে নানা নরগোষ্ঠীর লোকের সমাবেশ হত। এবং তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে, তাকে ওইখানেই সমাধি দেওয়া হত।

॥ দুই ॥

উপরে সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের যে নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত নরকঙ্কালের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এরূপ নরকঙ্কাল আমরা মহেঞ্জোদারো থেকে পেয়েছি ৪১টি, হরপ্পা থেকে ২৬০টি, চান্হুদারো থেকে একটি, রূপার থেকে ২১টি,ও পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে ১৪টি। এসব নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে ওই সব জায়গার সমাধিস্থান থেকে। এ সম্বন্ধে একটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে—মহেঞ্জোদারোর তুলনায় হরপ্পা থেকে বেশি নরকঙ্কাল পাওয়া। কেননা, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে মহেঞ্জোদারোই ছিল সবচেয়ে বড় শহর। সুতরাং সেই কারণে হরপ্পার তুলনায় মহেঞ্জোদারো থেকেই বেশি সংখ্যক নরকঙ্কাল পাওয়া উচিত ছিল। এ থেকে কি সিদ্ধান্ত করতে হবে যে হরপ্পার তুলনায় মহেঞ্জোদারোর স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নত ধরনের ছিল, যার ফলে সেখানে মৃত্যুহার কম ছিল? না এটা এক আপতিক ঘটনা মাত্র?

॥ তিন ॥

এবার আমরা সমাধি প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলব। হরপ্পায় যে প্রথার প্রাধান্য ছিল, তা হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে লম্বালম্বি চিৎ করে শুইয়ে কবর দেওয়া। মৃত ব্যক্তির মাথা উত্তর দিকে স্থাপিত করা হত এবং তার সঙ্গে পরলোকে ব্যবহারের জন্য মৃৎপাত্র এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অলংকার প্রভৃতি দেওয়া হত। হরপ্পায় ইষ্টকনির্মিত সংকীর্ণ কক্ষের আকারের সমাধিও পাওয়া গিয়েছে। মৃতব্যক্তিকে 'কফিন'-এ আবদ্ধ করে সমাধিস্থ করার নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। এরূপ সমাধি কি মিশর দেশ থেকে আগত ব্যক্তির সমাধি? কালি-বঙ্গনে আমরা আরও দুই প্রকার সমাধির প্রাবল্য লক্ষ্য করি। এক প্রকার হচ্ছে গোলাকার গহ্বরের মধ্যে বৃহৎ এক ভস্মাধার স্থাপন করা। এরূপ সমাধির মধ্যে আমরা কোন নরকঙ্কাল পাইনি। অপর রকম সমাধি হচ্ছে প্রচলিত সাধারণ সমাধি, যার মধ্যে সংগৃহীত অস্থিসমূহ সমাধিস্থ করা হত। লোথালে আমরা এক বিশেষ ধরণের সমাধি লক্ষ্য করি। একই সমাধির মধ্যে পাশাপাশি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে সমাধি দেওয়া হয়েছে। এসব স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়, তা হলে আমরা কি সিদ্ধান্ত করব যে সে যুগে 'সতী' প্রথার প্রচলন ছিল? সব শেষে বলি পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে মৃতকে সমাধিস্থ করা হত পূর্ব-পশ্চিম দিকে শায়িত করে। এথেকে প্রকাশ পায় যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার নগরসমূহের পতন

খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের গোড়ার দিকে মহেঞ্জোদারো, এবং খুব সম্ভবত হরপ্পা নগরদ্বয়ের পতন ঘটে। সিন্ধু উপত্যকায় এ দুটি নগরের আবির্ভাব যেমন সহসা ঘটেছিল, তাদের তিরোধানও তেমনই সহসা হয়েছিল। (উল্লেখনীয় যে সমসাময়িককালে প্রাদুর্ভূত ক্রীট দ্বীপের মিনওয়ান সভ্যতারও এরূপ সহসা আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটেছিল)। উৎখননের ফলে যে তথ্য আমরা পাই তা হচ্ছে, বিলুপ্তির দু-এক শতাব্দী আগে থেকেই হরপ্পা সভ্যতার অবনতি ঘটছিল: নগরের ঘরবাড়ির আর আগেকার মত সৌষ্ঠব ছিল না; নূতন ঘরবাড়ি পুরাতন ব্যবহৃত ও ভগ্ন ইট দিয়ে তৈরী করা হচ্ছিল। নগরের পৌর অধিকর্তাদের শাসন-বিধান আর কেউ মানছিল না। রাস্তায় ওপরেই জমি অধিকার করে লোক ঘরবাড়ি তৈরী করছিল। এমন কি সরকারী জমির ওপরেও ইমারত তৈরী করছিল। ইট পোড়াবার জন্ম শহরের মাঝখানেই পাঁজা বা চুল্লি তৈরী করছিল। এক কথায় নাগরিক জীবনে একটা বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাচ্ছিল। সেজন্য অনেকে মনে করেন যে এই নাগরিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্যে মহেঞ্জোদারো নগরীর পতনের বীজ নিহিত ছিল। আবার অনেকে মনে করেন যে টাইফয়েড, কলেরা বা বসন্তের মত কোন মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলেই নগরীর অধিবাসীরা নগর পরিত্যাগ করেছিল। আবার অনেকে মনে করেন যে মহেঞ্জোদারো অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল এবং তার ফলেই পরিত্যক্ত হয়েছিল।

॥ দুই ॥

রেকস্ (Robert L. Raikes) ও ডেলস্ (George F. Dales) মনে করেন যে বন্যার দ্বারা প্লাবিত হওয়ার ফলেই মহেঞ্জোদারো পরিত্যক্ত হয়েছিল। বন্যার প্রতিঘাত যে মহেঞ্জোদারোর লোকদের মাঝে মাঝে গৃহহীন করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, মহেঞ্জোদারো নগরীর যে stratigraphic study করা

হয়েছে, তা থেকে আমরা অবগত হই যে মহেঞ্জোদারো সাতবার বন্যা দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবং সাতবার ওই নগরী পুনর্নির্মিত করা হয়েছিল।

মহেঞ্জোদারো নগরী যে সাতবার বন্যা বিধ্বস্ত হয়েছিল, এটা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত। এরূপভাবে পুরাতন বসতির ভিত্তির ওপর পুনঃ পুনঃ নূতন বসতি নির্মানের ফলে শহরটা ক্রমশই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে বসে যেতে আরম্ভ করেছিল। তাতে শহরের কর্ম-চঞ্চলতা ব্যাহত হয়ে ক্রমশ সভ্যতার অবনতি ঘটছিল। এ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে জর্জ ডেলস বলেছেন—"The mature phase of the Harappan civilization at Mohenjodaro appears to have degenerated into a well-defined late phase that in turn fades into a squatter phase. Both the materials and style of later artifacts and the quality of later architecture demonstrate a gradual process of degeneration. The traditional painted pottery of the mature phase, with its intricate black-and-red designs is replaced in the late phase by plain unpainted ware. In contrast to the typical seals of the mature phase, carved out of soapstone with animal figures in negative relief, the late phase seals are not made of soapstone and bear only a few simple geometric designs. The deftly executed and spirited animal figurines of the mature phase are reflecting much crude effigies. Even the buildings erected during the squaiter phase reflect the same degeneration. They are jerry-built and often made of broken or secondhand bricks. These examples of diminishing prosperity or at least of a debasement in the Harappan civilization's standards of values, suggest an associated breakdown in the efficiency of State adm nistration. Perhaps not only Harappan prosperity but also the Harappan spirit was being mired in an unrelenting sequence of invading water and engulfing silt". এক কথায় রাজনীতি, অর্থনীতি এবং প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে মহেঞ্জোদারো ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছিল। গুজরাটে ৮০টি পরিণত হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রের একই গতি হয়েছিল।

॥ তিন ॥

মহেঞ্জোদারো বাণিজ্যিক নগর ছিল। সেজন্য মনে হয় যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নিম্ন-সিন্ধু-উপত্যকায় ও ১৯৩৫ সালে বেলুচিস্তানে যেরূপ ভূমিকম্প ঘটেছিল, মহেঞ্জোদারোর নিকটবর্তী কোন স্থানে অনুরূপ ভূমিকম্পের প্রকোপে, মাটির তলায় যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (tectonic) ঘটেছিল, তার ফলে মহেঞ্জোদারো বাসের পক্ষে অনুপযোগী হয়েছিল, এবং সে কারণেই মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা মহেঞ্জোদারো পরিত্যাগ করে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এবং সেখানে নূতন পরিবেশের মধ্যে ও স্থানীয় শিল্পিক কৌশল রীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে হরপ্পা সভ্যতা অন্তিম দশা প্রাপ্ত হয়েছিল। এক কথায়, হরপ্পা সভ্যতা একেবারে খতম হয়ে যায়নি, নূতন পরিবেশ ও প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় এক নূতন রূপ ধারণ করে জীবিত ছিল। তাদের এই দুর্দিনের সময়েই ভারতে আর্য-আক্রমণ ঘটেছিল।

॥ চার ॥

আগেই বলেছি যে মহেঞ্জোদারো বন্যার দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল, এ মতবাদ পেশ করেন রবার্ট এল. রেকস্ (R. L. Raikes in American Anthropologist' vol 66, No. 2, 1964 pages 284-299) এবং জর্জ এফ. ডেলস্ (George F. Dales in 'Scientific America' vol. 211 No. 5, 1966 pages 92-100)। কিন্তু এই মতবাদের বিরোধিতা করেছেন ল্যামব্রিক (H. T. Lambrick, 'Geographical Journal' vol. 133 pt 4, 1967, pages 483-499), রেকস্ ও ডেলস্ তাঁদের মতবাদের সমর্থনে যে-সব যুক্তি দিয়েছিলেন, ল্যামব্রিক সেগুলো সব খণ্ডন করেছেন। এক কথায় মহেঞ্জোদারো যে বন্যা দ্বারা প্লাবিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল, এ মতবাদ অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

স্যার মার্টিমার হুইলার মনে করেন যে সিন্ধু সভ্যতার নগরসমূহ আগন্তুক আর্যদের দ্বারাই আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেন যে ঋগ্বেদে বর্ণিত ইন্দ্র দ্বারা বিনষ্ট নগরীসমূহ সিন্ধু সভ্যতার নগর-সমূহ ছাড়া, আর কিছুই নয়। তিনি বলেন—"Climatic, economic, political deterioration may have weakened it, but its ultimate destruction is more likely to have been completed by deliberate and large-scale destruction" (R. Mortimer Wheeler, 'Ancient India', No. 8, 1947, pages 73-82) স্যার মার্টিমার হুইলারের বিশ বৎসর পূর্বে ১৯২৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দে আমিও সেই কথাই বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমি এই মতবাদও প্রতিষ্ঠা করেছিলাম যে বৈদিক আর্যরা হরপ্পা সভ্যতার নগরসমূহ ধ্বংস করেছিল বটে, কিন্তু হরপ্পা সভ্যতাকে বিনষ্ট করতে পারেনি। পরবর্তীকালের হিন্দু সভ্যতাই হরপ্পা সভ্যতার বিবর্তিত রূপ। (A. K. Sur, Pre-Aryan Elements in Indian Culture, 1931).

গ্রন্থপঞ্জী

Alchin, B. & R.—The Birth of Indian Civilization, 1934.

Chakravorty, B. B.—Message of the Indus Script 1934.

Childe, Gordon—New Light on the Most Ancient East, 4th edition, 1952.

" " —The Aryans, 1926.

Dales, G. F.—New Investigations at Mohenjo-daro, 1934.

Dasgupta, P. C.—Excavations at Pandu Rajar Dhibi, 1934.

Gordon, D. H,—The Prehistoric Background of Indian Civilization, 1934.

Hazra, S.—Decipherment of Indus Script, 1934.

Hunter, G. R.—The Script of Harappa & Mohenjo-daro, 1934.

Mackay, E. J. H.—Further Excavations at Mohenjo-daro, 1934.

Marshall, Sir John—Mohenjo-daro & Indus Civilization, 1931.

(১) সিন্ধু সভ্যতার সীল

Seals.

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট